যুগে যুগে
মওলানা ভাসানীর সংগ্রাম

শাহ আহমদ রেজা

যুগে যুগে মাওলানা ভাসানীর সংগ্রাম

যুগে যুগে মওলানা ভাসানীর সংগ্রাম

শাহ আহমদ রেজা

কাশবন প্রকাশন, ঢাকা

যুগে যুগে মওলানা ভাসানীর সংগ্রাম
শাহ আহমদ রেজা

প্রথম প্রকাশ
একুশের বইমেলা ২০১৩

স্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
মোঃ নূরুল ইসলাম

প্রকাশক
আমিনুল ইসলাম
কাশবন প্রকাশন
২৫৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৫২-৩৩০৯০৮
email : kashban@gmail.com
fb.com/kashbanbd

অক্ষরবিন্যাস
শাওন কম্পিউটারস
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-ফয়সল প্রিন্টিং প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
জাগৃতি : আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
বিদ্যাজগৎ : ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN : 978-984-8907-52-8

উৎসর্গ

আমার বড় ভাই মরহুম শাহ মাহমুদ রেজা (১৯৪৫-১৯৮২)
এস এম রেজা নামে বেশি পরিচিত যিনি
১৯৬০-এর দশকে বহুবার কারানির্যাতিত হয়েছেন।
স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও তাঁকে কারাগারেই কাটাতে হয়েছিল।
রাজনীতিতে তিনি মওলানা ভাসানীর অনুসারী ছিলেন।

লেখকের কথা

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সম্পর্কে জানাতে হলে অন্তত একশ বছরের ইতিহাস তুলে ধরা দরকার। কারণ, বাংলাদেশের মহান এই জাতীয় নেতা মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ব্রিটিশ শাসনের অধীন বাংলা ও আসাম প্রদেশে ১৯২০-এর দশকে জমিদার-মহারাজা বিরোধী কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যমে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর চেষ্টাতেই বৃহত্তর সিলেট পূর্ব পাকিস্তানের তথা বর্তমান বাংলাদেশের অংশ হয়েছে। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দলটির সভাপতি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অর্জনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠন করেছে। দলের ক্ষমতাসীন নেতারা প্রদেশের স্বার্থবিরোধী অবস্থানে চলে যাওয়ার পর মওলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানানোর মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারণা শুরু করেছেন। ওই দিনগুলোতে স্বাধীনতার কথা বলা ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ, কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী নেতা মওলানা ভাসানী পরোয়া করেননি। এদেশের স্বার্থে নিজের হাতে গড়া আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেছেন তিনি, নতুন দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি– ন্যাপের মাধ্যমে স্বাধীনতামুখী স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছেন। ১৯৬৯-এর যে গণঅভ্যুত্থান পাকিস্তান সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল, সে গণঅভ্যুত্থানে প্রধান নেতার ভূমিকা পালন করেছিলেন মওলানা ভাসানী। সেটা ছিল এমন এক সময়, যখন অনেক আগে থেকে কারাগারে থাকায় শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু নেতার পক্ষে কোনো ভূমিকা পালন করাই সম্ভব ছিল না। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিলেন। স্বাধীনতামুখী সে অবস্থান থেকে জনগণকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

১৯৭০ সালের নভেম্বরে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে ১২ লাখের বেশি মানুষের মৃত্যুর পর পাকিস্তান সরকার চরম উপেক্ষা দেখিয়েছিল। সব দল যখন পাকিস্তানী নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত, ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ নেতা মওলানা ভাসানী তখন সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের নির্বাচন বর্জন করে মওলানা ভাসানী স্বাধীনতামুখী তৎপরতা ক্রমাগত জোরদার করেছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে স্বাধীনতার আহবানমুখে সোচ্চার ভাসানী জনগণের প্রতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার ডাক দিয়েছিলেন। ২৫ মার্চ গণহত্যার অভিযান শুরু করার পর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী সন্তোষে মওলানা ভাসানীর

বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তিনি আসাম দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভারত বিরোধী নেতা হিসেবে পরিচিতি থাকায় ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার তাঁকে নজরবন্দি অবস্থায় রেখেছিল। কিন্তু নিজের স্বাধীনতা হারিয়েও মওলানা ভাসানী দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে দেশপ্রেমিক প্রধান জাতীয় নেতার ভূমিকা পালন করেছেন। কলকাতায় গঠিত মুজিবনগর সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো এবং ওই সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়া ছিল তাঁর খুবই ফলপ্রসূ অবদান। মুজিবনগর সরকার গঠিত সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি হিসেবেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন।

এভাবে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয় অর্জন পর্যন্ত দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে মওলানা ভাসানী অগ্রবর্তী অবস্থানে থেকেছেন। স্বাধীনতার পরও তাঁর সে দেশপ্রেমিক ভূমিকা অব্যাহত ছিল। প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের শোষণ, লুণ্ঠন ও ভারতমুখী নীতি ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তিনিই সবার আগে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ভারতের সম্প্রসারণবাদী কর্মকান্ড ও পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার থেকেছেন এবং মৃত্যুর মাত্র ছয় মাস আগে, প্রায় ৯৬ বছর বয়সে ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন (১৬ মে, ১৯৭৬)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, অমন একজন সংগ্রামী জাতীয় নেতার নামও আজকাল যথাযথ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করা হয় না। তাঁকে নিয়ে বই-পুস্তকও খুব বেশি লেখা হয়নি। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে মানুষও তাই ভালোভাবে জানতে পারছে না। ওদিকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৩ সালের শুরুতে স্কুলের পাঠ্য বই থেকে মওলানা ভাসানীর জীবনী বাতিল করেছে। এর ফলে শিশু-কিশোররা মহান এই নেতার সংগ্রাম ও অবদান সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না। এমন এক অবস্থায় মওলানা ভাসানীকে উপস্থাপন করা জাতীয় দায়িত্ব মনে হয়েছে। গ্রন্থটি পরিকল্পিতও হয়েছে সে কারণে। তাই বলে তাঁর জীবনী নয়, বিভিন্ন সময়ের সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি নিবন্ধ রয়েছে গ্রন্থে। নিবন্ধগুলো পড়লেও পাঠকরা মওলানা ভাসানীর জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে মোটামুটি জানতে পারবেন।

প্রকাশক এবং 'কাশবন প্রকাশন'-এর স্বত্বাধিকারী আমিনুল ইসলামের আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। এক বছরের বেশি সময় অপেক্ষা করেছেন তিনি। দৈনিক আমার দেশ-এর ফিচার সম্পাদক কবি হাসান হাফিজের তাগিদ ছিল বিরামহীন। সত্যি বলতে কি, তার এ তাগিদেই গ্রন্থটি পাঠকের হাতে আসতে পেরেছে। সবশেষে, কিন্তু বিশেষভাবে আমার স্ত্রী রিজিয়া আহমদের কথা বলতেই হবে। কারণ, তার সান্নিধ্য, হাতের বানানো চা এবং সহযোগিতা ছাড়া শুধু এ গ্রন্থের পান্ডুলিপি তৈরি করা কেন, আমার পক্ষে লেখালেখি করাও সম্ভব হতো না।

শাহ আহমদ রেজা

২৭ জানুয়ারি, ২০১৩

সূচিপত্র

লেখকের কথা / ৭
আসামে ভাসানীর সংগ্রাম / ১১
পাকিস্তানের প্রাথমিক আন্দোলন / ৩০
আওয়ামী লীগ : দলের গঠন ও প্রতিষ্ঠাতা প্রসঙ্গ / ৪১
ভাষা আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা / ৪৬
'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা / ৫১
স্বাধীনতা সংগ্রামে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা / ৫৯
মওলানা ভাসানীর ফারাক্কা মিছিল / ৭৯
মওলানা ভাসানীর অনশন ও সেকালের রাজনীতি / ৮৭
মওলানা ভাসানীর সঙ্গে ঢাকা সফর / ১০৩
মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের সম্পর্ক / ১১১
মওলানা ভাসানী ও সিরাজ সিকদারের সম্পর্ক / ১১৮
নজরুলের ধর্মচিন্তা ও মওলানা ভাসানীর ইঙ্গিত / ১২৫
বাকশাল-এর প্রতি মওলানা ভাসানীর 'আশীর্বাদ' প্রসঙ্গে / ১২৯
খন্দকার মোশতাকের প্রতি মওলানা ভাসানীর সমর্থন প্রসঙ্গে / ১৩৫

আসামে ভাসানীর সংগ্রাম

বাংলাদেশের জাতীয় নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ও প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছিল ব্রিটিশ ভারতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দেশীয় সহযোগী জমিদার-মহারাজাদের বিরুদ্ধে এবং কৃষক-প্রজাদের পক্ষে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতাকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। কৃষক-প্রজাদের ওপর জমিদার-মহারাজাদের নির্মম শোষণ-নির্যাতন তাঁকে ক্ষুব্ধ-ব্যথিত ও প্রতিবাদী করেছিল, তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার সন্তান হলেও অবিভক্ত বাংলা এবং আসাম প্রদেশের সমগ্র অঞ্চল ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। হিন্দু জমিদারদের প্ররোচনায় পর্যায়ক্রমে তাঁকে সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং সবশেষে পূর্ব বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। মওলানা ভাসানী আসামে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১৯৩০-উত্তরকালে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক তৎপরতা প্রধানত আসামকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছিল। জমিদার-মহারাজাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার তাগিদ বোধ করেন এবং প্রথমে যোগ দেন গান্ধী-নেহরুদের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে। কিন্তু হিন্দু জমিদার-মহারাজাদের সমর্থনে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অবস্থান তাঁকে নিরাশ করে এবং তিনি অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগে যোগ দেন। তাঁকে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি করা হয়। ১৯৪৭ সালের আগস্টে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সময় পর্যন্তও তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন।

ব্রিটিশ ভারতে মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। জমিদার-মহারাজাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর পাশাপাশি তিনি ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামেও নেতৃত্ব দিয়েছেন। গ্রেফতার বরণসহ নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। এই নিবন্ধে মওলানা ভাসানীর সে ঘটনাবহুল জীবনের সামান্য কিছু অংশের উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্য এবং নীতি-কৌশল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। প্রাথমিক ঘটনা হিসেবে সিরাজগঞ্জের প্রজা সম্মেলনকে সামনে আনা হয়েছে এজন্য যে, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই মওলানা ভাসানী ব্রিটিশ ভারতের রাজনীতিতে প্রথমবারের মতো ব্যাপক পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন একজন দুর্দান্ত সাহসী মজলুম জননেতা হিসেবে।

সিরাজগঞ্জ প্রজা সম্মেলন

১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে মওলানা ভাসানী আয়োজিত সিরাজগঞ্জ প্রজা সম্মেলন ব্রিটিশ সরকারের একটি দমনমূলক পদক্ষেপের কারণে অভূতপূর্ব প্রচার লাভ করেছিল। নির্ধারিত তারিখের কয়েকদিন আগে মওলানা ভাসানী এবং সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যদের ওপর ১৪৪ ধারাসহ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল। সরকারি এই নির্দেশের বিরুদ্ধে কলকাতায় মুসলিম নেতারা সে সময় তৎপর হয়ে ওঠেন, নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সহ-সভাপতি খান বাহাদুর আবদুল মোমিন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গিয়ে প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানান। সিরাজগঞ্জের মতো মহকুমাভিত্তিক প্রজা সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যদি সারা বাংলা প্রদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে– প্রধানত এই আশংকায় গভর্নর মুসলিম নেতাদের দাবি মেনে নেন, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। সাময়িককালের জন্য আন্দোলন স্তিমিত হলেও নিষেধাজ্ঞাসহ সরকারের পদক্ষেপের কারণে মওলানা ভাসানীর নাম এবং সিরাজগঞ্জ প্রজা সম্মেলনের কথা অবিভক্ত বাংলা ও আসামের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। পত্রপত্রিকায় অত্যধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছিল। ফলে একটি মহকুমার প্রজাদের জন্য পরিকল্পিত সম্মেলন রাতারাতি প্রাদেশিক সম্মেলনের গুরুত্ব ও মর্যাদালাভ করেছিল। বাংলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার কৃষক-প্রজা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। এসেছিলেন সেকালের খ্যাতনামা মুসলিম নেতাদের অনেকেও। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের ডেপুটি মেয়র হিসেবে (১৯২৪) রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে মওলানা ভাসানী সম্মেলন উদ্বোধন করিয়েছিলেন, সভাপতি বানিয়েছিলেন খান বাহাদুর আবদুল মোমিনকে। সিরাজগঞ্জের এই প্রজা সম্মেলন সম্পর্কে সংক্ষেপে সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ, যিনি নিজেও সেখানে গিয়েছিলেন ময়মনসিংহ জেলা থেকে : '...গিয়া দেখি এলাহি কারখানা। সম্মেলন তো নয়... জনতাকে জনতা। লোকের মাথা লোকে খায়। হয়তো বা লক্ষ লোকই হইবে। সদ্য ধান কাটা ধানক্ষেতসমূহের সীমাহীন ব্যাপ্তি। যতদূর নজর যায় কেবল লোকের অরণ্য। এই বিশাল মাঠের মাঝখানে প্যান্ডেল করা হয়েছে। প্যান্ডেল মানে একটি চারদিক খোলা মঞ্চ। উপরে একটি সামিয়ানা। সেই বিশাল জনতার মাথায় সে সামিয়ানাটা যেন একটি টুপিও নয়, টিকি মাত্র...।' ('আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৫, পৃ. ৮২-৮৩)

সিরাজগঞ্জে মওলানা ভাসানী আয়োজিত প্রজা সম্মেলনের ঐতিহাসিক গুরুত্বলাভের পেছনে কারণ হিসেবে অবদান রেখেছিল এতে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাব। এগুলোর মধ্যে ছিল জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, খাজনার নিরিখ হ্রাস, নজর সেলামী

বাতিল, জমিদারের প্রিয়েমশন অধিকার রদ, মহাজনের সুদের হার নির্ধারণ এবং চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের আইনকে বাতিল ঘোষণার দাবি। মূলত এ সম্মেলনের দাবিগুলোর ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে কৃষি খাতক আইন (১৯৩৬) পাস হয়েছিল এবং ১৯৩৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল ঋণ সালিশী বোর্ড। অন্য কথায়, মওলানা ভাসানীর এই সম্মেলন বাংলার নিপীড়িত কৃষক-প্রজাদের সরাসরি মঙ্গলবিধানে সহায়তা করেছিল, সেই সঙ্গে এর ফলে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল জমিদার-মহানজ বিরোধী আন্দোলনও। উল্লেখ্য, সিরাজগঞ্জ প্রজা সম্মেলন মওলানা ভাসানীকেও ভারতজুড়ে দিয়েছিল খ্যাতি এবং বিপুল জনপ্রিয়তা।

কংগ্রেস থেকে মুসলিম লীগে

প্রসঙ্গক্রমে মওলানা ভাসানীর উদ্দেশ্যের দিকটিকে আলোচনায় আনা দরকার। লক্ষ্যণীয় যে, এই সময়কালে তিনি এমন এক ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন, যা শুধু জমিদার প্রধান সংগঠনই ছিল না, ছিল জমিদার বিরোধী আন্দোলনেরও বিরোধী। বঙ্গীয় আইন পরিষদে ১৯২৮ সালে উত্থাপিত প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে কংগ্রেস সদস্যরা ভোট দিয়েছিলেন প্রজাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, জমিদার-মহারাজাদের পক্ষে। অন্যদিকে তখনও পর্যন্ত মওলানা ভাসানী নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতিতেও যোগ দেননি, যদিও তিনিই ছিলেন বাংলা ও আসামের কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সবচেয়ে সক্রিয় এবং সংগ্রামী নেতা।

ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মওলানা ভাসানীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জমিদার-মহারাজা বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নির্যাতিত কৃষক-প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কংগ্রেস করতেন তিনি একটি মাত্র কারণে। ব্রিটিশ সরকার বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্যে অগ্রসরমান অসংখ্য ঘটনা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে মওলানা ভাসানী দেখেছিলেন, ব্রিটিশরা ছিল জমিদারদের স্বার্থের প্রত্যক্ষ রক্ষক এবং অভিভাবক। ফলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে তীব্রতর করা না গেলে জমিদার বিরোধী আন্দোলনকেও সফল করা সম্ভব হবে না– সঠিক এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি আসলে চলমান জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে কৃষক-প্রজার আন্দোলনকে সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু কংগ্রেসের জমিদারপ্রীতি মওলানা ভাসানীকে হতোদ্যম করেছিল। জমিদারের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায় থেকে আগত। ফলে জমিদার বিরোধী আন্দোলনকে সাধারণভাবে হিন্দু বিরোধিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হতো এবং সেখানেই কংগ্রেসের সঙ্গে সৃষ্টি হতো সংঘাতের। এভাবে সংঘাতের ঘটনা বেড়েছে ক্রমাগত আর তাই মওলানা ভাসানী বেশিদিন কংগ্রেসে টিকে থাকতে পারেননি। ১৯৩৭ সালে তিনি যোগ দিয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগে। মুসলিম লীগেও

অনেক জমিদার ছিলেন, কিন্তু বাংলা ও আসামের কৃষক-প্রজাদের গরিষ্ঠ অংশ মুসলমান থাকায় দলটিকে সামগ্রিকভাবে জমিদার বিরোধী অবস্থান নিতে হয়েছিল।

উল্লেখ্য, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম লীগে যোগ দিলেও কোনো পর্যায়েই মওলানা ভাসানী জমিদার বিরোধী আন্দোলনের প্রশ্নে নমনীয় হননি, বরং নিজের সংগ্রামকে ভারতভিত্তিক একটি সংগঠনের সঙ্গে প্রথিত করার মাধ্যমে তীব্রতা দেয়াই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। একথার প্রমাণ মেলে বিশেষ করে আসামে তাঁর পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনায়। আন্দোলনের কোনো কোনো পর্যায়ে তাঁকে মুসলিম লীগেরও বিরুদ্ধাচারণ করতে হয়েছে, প্রতিবাদে দাঁড়াতে হয়েছে এমনকি নিজের দলেরই ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি : কৃষক-প্রজাদের স্বার্থকে সমুন্নত রাখা এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন

এ কথার প্রমাণ হিসেবে আসামের লাইন প্রথার বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস উল্লেখ করা যেতে পারে। আসাম সরকার কুখ্যাত এ লাইন প্রথার প্রবর্তন করেছিল পূর্ব বাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আগত ভূমিহীন কৃষকদের দমন ও বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে। বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন বাঙালী আসামে গিয়েছিল জীবিকার অন্বেষণে। দলে দলে তারা যেতো, বিপদসংকুল বিরাট বিরাট বন আর জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে তারা বসতি স্থাপন করতো এবং চাষ করতো এতকালের পরিত্যক্ত ভূমি। প্রথম দিকে আসাম সরকার বা অহমীয়দের কেউই বাঙালীদের বাধা দেয়নি বরং উৎসাহিত করেছে। কারণ, এর ফলে বিপুল চাষোপযোগী ভূমির সৃষ্টি হতো এবং ফসলের উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয়ও বাড়তো যথেষ্ট পরিমাণে। ১৯৪৪ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, কেবল ময়মনসিংহ জেলা থেকে আগত বাঙালীদের কারণেই আসাম সরকারের রাজস্ব আয় ৩০ বছরে বেড়েছিল প্রায় ৪৫ লাখ টাকা এবং এই সময়কালে অহমীয়দের নিকট থেকে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮০ লক্ষ টাকা। (দেখুন : বিমল জে দেব ও দিলীপ কুমার লাহিড়ীর নিবন্ধ 'দ্য লাইন সিস্টেম ইন আসাম : এ স্টাডি অব দ্য রোল অব মওলানা ভাসানী', ১৯৭৮ সালের আগস্ট সংখ্যা জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এ মুদ্রিত) প্রত্যক্ষ এই দ্বিমুখী উপকার সত্ত্বেও ১৯২০ সালের পর থেকে বাঙালীদের প্রতি আসাম সরকার ও অহমীয় জনগণের মনোভাবে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এর কারণ, বিপুল সংখ্যায় বাঙালীর আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি হয় যে, অচিরেই অহমীয়রা আসামে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলবে। বিশেষ করে গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দাড়ং, নওগাঁং, শিবসাগর এবং

লাকিমপুর জেলাসমূহে বাঙালীদের দ্রুত বেড়ে চলা সংখ্যা এই আশংকাকে দৃঢ়মূল করেছিল। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, গোয়ালপাড়া জেলার ১৯১১ সালে মোট ৭৭ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ময়মনসিংহ থেকে আগত বাঙালীর সংখ্যা ছিল ৩৪ হাজার; এই সংখ্যা ১৯২১ সালে ৭৮ হাজার (মোট এক লাখ ৫১ হাজার) এবং ১৯৩১ সালে ৮০ হাজার (মোট এক লাখ ৭০ হাজার) হয়েছিল। (পূর্বোক্ত নিবন্ধ দেখুন)

সে পরিস্থিতিতে আসাম সরকার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে লাইন প্রথার প্রবর্তন করেছিল। এই আইন অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমির ওপর দাগ বা লাইন দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করা হতো : বাঙালীরা নির্দিষ্ট লাইনের বাইরে গিয়ে বসতি স্থাপন বা চাষাবাদ করতে পারতো না। আগে থেকে যারা লাইনের অন্যদিকে বসবাস করছিল, তাদেরকেও উচ্ছেদ করে পাঠানো শুরু হয় নির্দিষ্ট লাইনের সীমানার ভেতরে। উচ্ছেদ অভিযানে সরকার কঠোর দমননীতির পন্থা গ্রহণ করতো। সকল ক্ষেত্রেই হাতি দিয়ে বাঙালীদের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে ফেলা হতো, আগে থেকে যথাযথ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার কোনো প্রয়োজন তারা বোধ করতো না। এর ফলে প্রবাসী বাঙালীরা আবার নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছিল, হচ্ছিল সর্বস্বান্তও। বাঙালী বিরোধী এই লাইন প্রথা প্রথমে প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯২২ সালে। নওগাঁং জেলায় বসবাসরত বাঙালীরা এর শিকার হয়েছিল। সে আইনটিই ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করা হতে থাকে এবং ১৯৩০-এর দশকে এসে সেটা সর্বাত্মক হয়ে ওঠে। বাঙালীদের প্রতিটি আবাসিক এলাকাতেই চলতে থাকে সরকারের দগমননীতি, হাতি দিয়ে ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলার পাশাপাশি অগ্নিসংযোগের নতুন অত্যাচারে বাঙালীরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। আসামে প্রবাসী বাঙালীদের সে দুর্দিনেই দুর্দান্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি গড়ে তুলেছিলেন লাইন প্রথা বিরোধী দুর্বার আন্দোলন।

ভারত শাসন আইন, '৩৭ সালের নির্বাচন এবং ভাসানীর আন্দোলন

আসামে প্রবাসী বাঙালী কৃষকদের পক্ষে মওলানা ভাসানী ১৯৩২ সালে লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত একে সর্বাত্মক রূপ দেয়া সম্ভব হয়নি। গোয়ালপাড়া, কামরূপ এবং নওগাঁং-এর মতো কয়েকটি মাত্র জেলায় আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল আর এর কারণ, এই জেলাগুলোতে ব্রিটিশ সরকার নিপীড়ন চালিয়েছে ভয়ংকরভাবে। আন্দোলনের ক্রমাগত তীব্রতা সত্ত্বেও সরকারি নিপীড়ন অব্যাহতই থেকেছে। কেননা, জাতীয় কিংবা অন্তত প্রাদেশিক ভিত্তিতে সমর্থন ও বিস্তৃতি ছাড়া অমন একটি আন্দোলনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। মওলানা ভাসানীকে তাই সমগ্র আসামভিত্তিক আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ঘোষিত ভারত শাসন আইন মওলানা

ভাসানীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ এনে দিয়েছিল।

আইনটিতে ভারতের প্রদেশগুলোর জন্য স্বায়ত্তশাসনের বিধান সংযোজিত হয় এবং তার ভিত্তিতে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্বায়ত্তশাসন এবং নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আসামের রাজনীতি সে সময় পরিষ্কার দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল : স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহ এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ প্রভাবিত অংশটি প্রবাসী বাঙালীদের স্বার্থ সমুন্নত রাখার অঙ্গিকার ঘোষণা করেছিল। দ্বিতীয় ধারার নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেস নেতা গোপীনাথ বড়দলুই। কংগ্রেস বাঙালীদের অধিকারকে স্বীকার করতো না। এই দলটির মতে, আসামে বাঙালীরা কেবল বহিরাগতই ছিল না, তারা ছিল আক্রমণকারী এমন এক বিজয়ী শক্তিও, যারা অবাধে বসবাস করার সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে খোদ অহমীয়দেরকেই আসাম থেকে বিতাড়িত করবে। কংগ্রেস তাই বাঙালী বিরোধিতাকে নির্বাচনের অন্যতম কর্মসূচি বানিয়েছিল। সেই সঙ্গে প্রথমবারের মতো আসামে উচ্চারিত হয়েছিল নতুন একটি স্লোগান– 'বাঙাল খেদাও।' কিন্তু চরম আঞ্চলিকতাবাদী প্রচারণা চালিয়েও ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করতে পারেনি, আসাম প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল মুসলিম লীগ। উল্লেখ্য, এই বিজয়ের পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল প্রবাসী বাঙালী কৃষকের এবং তাদের নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা ভাসানী। বিজয়ের ফলে প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহ। সাদুল্লাহ নিজে ছিলেন একজন অহমীয়। প্রথমেই তিনি মুসলিম লীগে যোগ দেননি। তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন ইউনাইটেড মুসলিম পার্টির পক্ষ থেকে। দলের কর্মসূচি, বিশেষ করে লাইন প্রথা বাতিলের দাবি বাস্তবায়নের অঙ্গিকার করার মাধ্যমে তিনি মুসলিম লীগের সমর্থন পেয়েছিলেন এবং ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি ইউনাইটেড মুসলিম পার্টি ছেড়ে মুসলিম লীগেও যোগ দিয়েছিলেন।

পরিষদের ভেতরে-বাইরে লাইন প্রথার বিরোধিতা

মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে ১৯৩৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর আসাম প্রাদেশিক পরিষদে লাইন প্রথা বাতিলের দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। প্রবাসী বাঙালীদের পক্ষে মনোয়ার আলীর উত্থাপিত প্রস্তাবের সমর্থনে ভাষণ দিতে গিয়ে মওলানা ভাসানী বিপদসংকুল বিরাট বিরাট জঙ্গল পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে বিপুল ফসল ফলানোর মাধ্যমে আসামের খাদ্য ও অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আনা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে বাঙালীদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। পূর্ব বাংলা থেকে বিতাড়িত অসহায় এই সর্বহারা জনগোষ্ঠীর প্রতি সদয় নীতি ও মনোভাব গ্রহণের জন্য তিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অহমীয়দের প্রতি আবেদন জানান।

মওলানা ভাসানী প্রসঙ্গত বলেন, বাঙালীদের বিতাড়িত করার মধ্যে আসামের কোনো মঙ্গল নিহিত নেই বরং বাংলা ও আসামসহ সমগ্র ভারতের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে 'স্বরাজ'।

প্রাদেশিক পরিষদে প্রদত্ত এই ভাষণের মধ্য দিয়ে লাইন প্রথা বিরোধী এতদিনের আঞ্চলিক আন্দোলনকে মওলানা ভাসানী সমগ্র আসামভিত্তিক আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। এই আন্দোলন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, পরিষদের ভেতরে-বাইরে ছিল এর সমান প্রচণ্ডতা। আন্দোলনের ফলে প্রদেশের মন্ত্রিসভায় পবিরর্তন এসেছে, পতন ঘটেছে দু'টি সরকারের এবং সবচেয়ে বড় কথা, অন্যায় এ আইনটির বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী জাতীয় ভিত্তিতে সমর্থন অর্জন করেছিলেন। এমনকি কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতারাও বাঙালীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন।

লাইন প্রথা বিরোধী সে আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাসের আলোচনায় না গিয়ে প্রাসঙ্গিক একটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো গেলে মওলানা ভাসানীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হতে পারে (আগ্রহী পাঠকরা পূর্বে উল্লেখিত এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধটি পড়তে পারেন)। উত্থাপিত দাবির প্রতি বলিষ্ঠ নিষ্ঠা ছিল আন্দোলনকালে মওলানা ভাসানীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন তিনি লাইন প্রথা বাতিলের আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে, একই কারণে তিনি আসামের সন্তান স্যার সাদুল্লাহকেও প্রধানমন্ত্রী হতে সহায়তা করেছিলেন।

সাতটি সম্মেলন

কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পর স্যার সাদুল্লাহ ক্রমশ তার ঘোষিত অঙ্গিকার থেকে সরে যেতে থাকলে মওলানা ভাসানীই প্রথম প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। এই প্রতিবাদ তিনি কেবল প্রাদেশিক পরিষদের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং একে যুক্ত করেছিলেন চলমান সামগ্রিক আন্দোলনের সঙ্গেও। মুসলিম লীগের ভেতরে তিনি সাদুল্লাহ বিরোধী মনোভাব তৈরি করেছেন, বিভিন্ন সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তীব্রতা দিয়েছেন লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনকে। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো : ১. ১৯৩৯ সালের ১৮ নভেম্বর ঘাগমারীতে অনুষ্ঠিত আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলন; ২. ১৯৪১ সালের ৩০-৩১ জানুয়ারি সিলেটের হবিগঞ্জে অনুষ্ঠিত আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলন: ৩. ১৯৪২ সালের ৮-৯ ফেব্রুয়ারি ঘাগমারীতে অনুষ্ঠিত আসাম-বাংলা প্রজা সম্মেলন ও প্রবাসী বাঙালীদের সম্মেলন (এতে সভাপতিত্ব করেন আল্লামা

আজাদ সুবহানী); ৪. ১৯৪৩ সালের ৩০ আগস্ট সিলেটে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলন; ৫. ১৯৪৪ সালের ২৭-২৯ ফেব্রুয়ারি ধুবড়ির আদাবাড়ি এবং গোড়াইমারী ও তুলশিবাড়িতে অনুষ্ঠিত পৃথক তিনটি সম্মেলন; ৬. ১৯৪৪ সালের ৭-৮ এপ্রিল বড়পেটায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সম্মেলন; এবং ৭. ১৯৪৫ সালের ২১ মে মঙ্গলদহে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশন।

বড়পেটা সম্মেলন : প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লাহর বিরোধিতা

এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৪৪ সালের বড়পেটা সম্মেলন। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল উপলক্ষে আয়োজিত এ সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রধামন্ত্রী স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দলীয় মনোভাব ব্যক্ত করা। সম্মেলনের মঞ্চে টাঙানো অসংখ্য পোস্টারের বক্তব্যের মধ্যে ছিল 'জমি দাও, না হলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করো,' 'প্রবাসীরা বাঁচতে চায়', 'আমরা সেইখানে বাস করতে চাই যেখানে পশুরা বসবাস করে' প্রভৃতি।

বড়পেটা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জমান। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী ও দলীয় প্রধানমন্ত্রী স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহর মধ্যকার বিরোধ মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে কাজী মোহাম্মদ ঈসা এবং মামদোতের নবাবকে এই সম্মেলনে পাঠানো হয়েছিল। মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের আহবান জানিয়ে বলেন, পরাধীনতাই বাঙালী এবং অহমীয়সহ ভারতীয় জনগণের সকল অভাব, দারিদ্র্য এবং কষ্টের মূল কারণ। আমরা দাসত্বে পদাঘাত করি এবং রক্তপিপাসু 'ইংরেজদের অবশ্যই ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করতে হবে' ঘোষণা করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত লাইন প্রথা বাতিলের দাবি জানিয়েছিলেন।

মওলানা ভাসানী তাঁর দীর্ঘ ভাষণে প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লাহর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট চারটি অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন : ১. লাইন প্রথা বিলোপের জন্য মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কোনো প্রচেষ্টা চালাননি; ২. ভূমি বন্দোবস্ত সম্মেলনে তিনি মুসলিম লীগ মুখপাত্রের পক্ষ অবলম্বব করেননি; ৩. মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে তিনি মুসলিম লীগের বক্তব্য সমর্থন করেননি; এবং ৪. সিলেট জেলায় জনসভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানীর ওপর আরোপিত ডেপুটি কমিশনারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রশ্নেও তিনি কোনো পদক্ষেপ নেননি। অভিযোগগুলো ছিল সুপ্রমাণিত এবং এর ফলে সম্মেলনে আগত প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের সামনে প্রধামন্ত্রীকে সাদুল্লাহকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়। জরুরি সরকারি কাজের অজুহাত দেখিয়ে তিনি সে রাতেই বড়পেটা থেকে রাজধানী গৌহাটি চলে যান।

'পার্থক্য কেবল টুপির...'

ক্ষমতাসীন দলের সভাপতি হয়েও দলীয় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী আয়োজিত এই বড়পেটা সম্মেলন উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল এক অসাধারণ ঘটনা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। এর মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানীর দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রকাশ ঘটেছিল। ক্ষমতা দখল কিংবা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তিনি রাজনীতি করেননি, মানুষের মঙ্গল বিধান করার একমাত্র উদ্দেশ্যে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন। আসামের রাজনীতিতে তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রবাসী বাঙালীদের নির্যাতনের কবলমুক্ত করা। এ জন্যই তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী পদে স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহকে সমর্থন করেছিলেন। সে সময় সাদুল্লাহর বিরোধিতা করার অর্থ ছিল কংগ্রেসের ক্ষমতা লাভ এবং সেটাই হয়েছিল। মওলানা ভাসানী তথাপি অবিচলিত ছিলেন তাঁর আন্দোলনে। এর কারণ, ব্যক্তি এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে দলের চাইতেও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল জনগণের স্বার্থ এবং সেজন্যই তাঁর চোখে স্যার সাদুল্লাহ ও কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলুই-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য ধরা পড়েনি। তিনি প্রকাশ্যেই বলতেন, 'সাদুল্লাহ এবং বড়দলুই-এর মধ্যে পার্থক্য কেবল টুপির। একজন টুপি পরেন, অন্যজন পরেন না।'

বলা দরকার, বড়পেটা সম্মেলনেই মওলানা ভাসানী প্রথম নিজ দলীয় ক্ষমতাসীনদের বিরোধিতা করেননি, তারও আগে বিভিন্ন সভা-সমাবেশেও তিনি একইভাবে নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে সোচ্চার হয়েছেন। ১৯৪৩ সালের ১৪ নভেম্বর আসাম প্রাদেশিক পরিষদে ভাষণদানকালে মুসলিম লীগ দলীয় মন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরীর উদ্দেশে তিনি বলেছিলেন, 'যে-ই যায় লংকায়, সে-ই হয় রাবণ।' অমন ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের কারণ, বন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই মতিন চৌধুরী ছিলেন আসামে মুসলিম লীগের প্রথম সংগঠক। প্রবাসী বাঙালীদের সমর্থনে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন, প্রাদেশিক পরিষদে লাইন প্রথা বাতিলের দাবিতে উত্থাপিত প্রস্তাবের পক্ষে ১৯৩৭ সালে তিনি অত্যন্ত জোরালো বক্তব্যও রেখেছিলেন। কিন্তু সে তিনিই মন্ত্রী হওয়ার পর চলে গিয়েছিলেন ব্রিটিশদের পক্ষে। তার মন্ত্রিত্বের দিনগুলোতেও বাঙালীদের ওপর অত্যাচার চলেছে সমান গতিতে।

এমনি বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী লক্ষ্য করেছিলেন, রাজনীতির অঙ্গনে বিচরণকারীদের বিরাট অংশই আসলে যে কোনো প্রকারে ক্ষমতায় যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণের পক্ষাবলম্বন করার অভিনয় করে থাকেন। ফলে ক্ষমতালাভ করার সাথে সাথে নিজেদের ঘোষিত অঙ্গিকার এবং কর্মসূচি থেকে বিচ্যুত হতে তাদের সংকোচ হয় না। এই উপলব্ধি থেকেই আসামের জীবনে মওলানা ভাসানী সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে তাঁকে অবশ্যই ক্ষমতাবিমুখ হতে হবে। কেননা, ক্ষমতা

মানুষের চরিত্র হনন করে এবং মুক্তির সংগ্রাম যেহেতু সুদূরপ্রসারী এক কঠোর প্রক্রিয়া, তাই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে কোনোক্রমেই ক্ষমতার শিকার হওয়া যাবে না।

'চরকা' নয়, স্বাধীনতার জন্য 'তরবারি'

বাস্তব অভিজ্ঞতাই মওলানা ভাসানীকে ক্ষমতা বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করতে প্রভাবিত করেছিল। আসামে লাইন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন, প্রবাসী বাঙালীসহ মুসলমানদের ভোটে এবং সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহ মুসলিম লীগের কর্মসূচি এবং জনগণের পরিপন্থী অবস্থান নিয়েছিলেন। এমনকি সাদুল্লাহর কঠোর সমলোচক হিসেবে পরিচিত অন্য দুই নেতা আবদুল মতিন চৌধুরী এবং মনোয়ার আলীও মন্ত্রিত্ব পাওয়া মাত্র সরে গিয়েছিলেন আন্দোলন থেকে, বিচ্যুত হয়েছিলেন ঘোষিত অঙ্গিকার থেকেও।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হিসেবে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর সামনে একটু ভিন্নরূপে এলেও বিষয়টি তাঁর জন্য একেবারে নতুন ছিল না। এ সম্পর্কিত ধারণা তিনি জমিদার-মহারাজা বিরোধী আন্দোলনর মধ্য দিয়ে আগেই অর্জন করেছিলেন। সাধারণ মানুষের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন, জমিদার-মহারাজা ও মহাজনদের শোষণ-পীড়ন ছিল জনগণের দুর্দশার প্রধান কারণ এবং এর যে কোনো বিরোধিতাকেই ইংরেজ সরকার নিষ্ঠুরভাবে দমন করতো। মওলানা ভাসানী তাই জমিদার-মহারাজাদের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারকেও সঠিকভাবেই জনগণের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, তাঁর আন্দোলনও সে লক্ষ্যেই পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়েছিল।

আন্দোলন মওলানা ভাসানীকে অন্য একটি জ্ঞানেও সমৃদ্ধি করেছিল : মানুষকে বাঁচাতে হলে সংগ্রাম করতে হবে শোষণের মূল ব্যবস্থা এবং তার লালনকারীদের বিরুদ্ধে, কেবল জমিদার বা ব্যক্তিবিশেষের বিরোধিতায় সুফল পাওয়া যাবে না। এজন্যই দেখা যায়, বিশেষ কোনো জমিদারের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ রাখার পরিবর্তে মওলানা ভাসানী তাঁর আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বাংলা ও আসামের সর্বত্র। তাঁর নেতৃত্বে কৃষক-প্রজার সেকালের সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছিল সামগ্রিকভাবে জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে। একযোগে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধেও। আসামের লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনকালেও একই দৃষ্টিকোণ থেকে মওলানা ভাসানী নিপীড়নমূলক আইনটিকেই বাতিল করাতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণিতও হয়েছিল : ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর নিজের দলীয় প্রতিনিধি স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহর শাসনকালে লাইন প্রথা কেবল বহালই ছিল না, বরং এর অত্যাচারও বেড়েছিল ভীষণভাবে। ফলে মওলানা ভাসানীর মনে এ ধারণাও দৃঢ়মূল হয়েছিল যে, কেবল ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পরিবর্তন সাধারণ মানুষের

মঙ্গল বিধান করতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় দিকটি ছিল তাঁর কৌশল– আন্দোলনকে তিনি মুক্তিলাভের পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, 'মানুষের মুক্তি আপসরফায় আসে না' ছিল তার অভিজ্ঞাতাপ্রসূত উপলব্ধি এবং সিদ্ধান্ত।

মওলানা ভাসানীর তৎকালীন আন্দোলনের কর্মসূচিও লক্ষ্য করা দরকার। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মতো ছকবাঁধা আপসকামী পথে তিনি পা বাড়াননি। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ করেছেন, কৌশল পরিবর্তনও করেছেন। মিছিল ও সমাবেশের পাশাপাশি তিনি অনশন করেছেন, সংসদীয় পন্থাকে আশ্রয় করার আশা নিয়ে নির্বাচনেও অংশ নিয়েছেন; কিন্তু বাইরে চলমান আন্দোলনকে কখনও স্তিমিত হতে দেননি। পূর্বে উল্লেখিত ঘটনাপ্রবাহের সূত্র ধরে প্রসঙ্গত তাঁর একটি বক্তব্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪০ সালের ২ এপ্রিল করিমগঞ্জের এক জনসভায় তিনি ব্রিটিশ তথা ইংরেজদের কবল থেকে স্বাধীনতা অর্জনকে মুক্তির প্রাথমিক শর্ত উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছিলেন, গান্ধীর মতো 'চরকা' কাটলে কিংবা অসহযোগতিার শান্তিপূর্ণ পথ ধরলে স্বাধীনতা আসবে না। স্বাধীনতা আনতে হবে এবং সেজন্য প্রয়োজনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের তরবারিও ধরতে হবে বলে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেছিলেন।

এই ঘোষণাকে তিনি বাস্তবায়ন করারও প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার অজুহাতে জনগণের আশু এবং মৌলিক সমস্যাগুলোকে তিনি পাশ কাটিয়ে যাননি, অন্যদের বরং সেই পথে টেনে আনতে চেয়েছেন। ইংরেজরা চলে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে গান্ধী-নেহরু-জিন্নাহরা সেকালে যে ভরসার বাণী শোনাতেন, মওলানা ভাসানী তার প্রভাব থেকে জনগণকে সযত্নে সরিয়ে এনেছিলেন প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথে। জনগণের শোষণমুক্তির জন্য তাঁর সে আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলেছিল ব্রিটিশ শাসনের শেষদিনগুলো পর্যন্ত। নিজ দলীয় প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লাহর শাসনকালে মওলানা ভাসানীর আন্দোলন সম্পর্কে আগেই জানানো হয়েছে। গোপীনাথ বড়দলুই-এর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকারের শেষদিনগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরালেও মওলানা ভাসানীর ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

কংগ্রেস শাসনকালে সংগ্রাম

লাইন প্রথার বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের চাপে আংশিকভাবে হলেও আসাম সরকারকে নীতি ও আইন পরিবর্তন করতে হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ১৩ জুলাই গৃহীত এক সংশোধিত প্রস্তাবে প্রাদেশিক সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ১৯৩৮ সালের ১ জানুয়ারির আগে যে বাঙালী ভূমিহীনরা আসামে এসেছে তাদের লাইন প্রথার শিকার হতে হবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে

আগতদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে এবং নতুন কাউকে আর আসামে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। কংগ্রেস দলীয় প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলুই-এর সরকার এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে শুরু করে। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাস থেকে বাঙালী কৃষকদের উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।

মওলানা ভাসানী সরকারের এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৪৬ সালের ৮ মার্চ তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালীদের আসামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার এবং পরিত্যক্ত খাসজমি চাষাবাদের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের আহবান জানানো হয়। মওলানা ভাসানী তাঁর বক্তৃতায় পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেন, গণবিরোধী সকল আইনকেই তিনি ও তাঁর দল অমান্য করবেন। দাবির সমর্থনে এই পর্যায়ে ১৯৪৬ সালের মে মাসে তিনি ১৬ দিন স্থায়ী অনশন শুরু করেন। গ্রেফতারকৃত ৮৩ জন বাঙালীকে মুক্তি দেয়ার পর মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে শেরে বাংলা ফজলুল হকের অনুরোধে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। তাঁর পক্ষে সেবার বড়পেটা আদালতে শেরে বাংলা নিজে মামলা পরিচালনা করেছিলেন। কংগ্রেস সরকারের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর আহবানে ৩১ মে সারা আসামে পালিত হয়েছিল প্রতিবাদ দিবস। মওলানা ভাসানী এরপর ১৯৪৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে লাইন প্রথা বিরোধী অব্যাহত আন্দোলনের কর্মসূচি পেশ করেন। 'জরুরি আবেদন' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে জমিদারি প্রথার বিলোপ, লাইন প্রথা বাতিল এবং পাটের মূল্য বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনে অংশ নেয়ার আহবান জানিয়ে তিনি সরকারকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'প্রয়োজনে বাজারে খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ করে দেয়া হবে।' ভীত কংগ্রেস সরকার প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করার মধ্য দিয়ে আন্দোলন দমন ও ভন্ডুল করার চেষ্টা শুরু করলে ১৬ সেপ্টেম্বরের বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী ১৪৪ ধারার আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, সরকার এই সুযোগে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্ররোচনা দিচ্ছে এবং এর পরিণতির জন্য সরকারকেই দায়ী হতে হবে।

ওদিকে আন্দোলন চলতে থাকা সত্ত্বেও আসামের কংগ্রেস সরকার লাইন প্রথার প্রয়োগ করতে থাকে। এই অত্যাচার বিশেষ করে কামরূপ, নওগাঁং এবং দাড়াং জেলায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণার আগে ১৯৪৬ সালের ১৭ ও ১৮ নভেম্বর গৃহীত মুসলিম লীগের প্রস্তাব অনুযায়ী মওলানা ভাসানী তাঁর বিবৃতিতে বিষয়টির প্রতি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি জওয়াহেরলাল নেহরু এবং লিয়াকত আলী খানকে মধ্যস্থতা করার জন্য আহবান জানান। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উদাসীনতা এবং প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলুই-এর বিরোধিতার ফলে তাঁর উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়ে যায়।

আইন অমান্য আন্দোলন এবং জমি দখলের আহবান

সে পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৩ জানুয়ারি তাঁর আহবানে আসামের সর্বত্র পালিত হয়েছিল 'কালো দিবস'। এ উপলক্ষে বিক্ষোভ মিছিল, প্রতিবাদ সভা এবং মসজিদে মসজিদে বিশেষ মোনাজাতের পাশাপাশি কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সমর্থন না দেয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলন তীব্র হতে পারেনি। মওলানা ভাসানী তখন সিলেটে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহবান করেন। ৯ ফেব্রুয়ারির সে সভায় প্রস্তাবিত আন্দোলনকে অসাম্প্রদায়িক রাখার এবং শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে বাহাদুরাবাদ ঘাটে বঙ্গ-আসাম মুসলিম লীগের যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর পরপর তিনি আসামের গোয়ালপাড়া জেলার বারবান্দায় আয়োজন করেন 'পূর্ব-পাকিস্তান সম্মেলন'। প্রায় ৭৫ হাজার মানুষের বিশাল এই সমাবেশে মওলানা ভাসানী আসাম সরকারের বাঙালী উচ্ছেদ অভিযানের তীব্র সমালোচনা করে এর বিরুদ্ধে 'জেহাদে' অংশ নেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। সম্মেলনস্থলকে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান কেল্লা' হিসেবে অভিহিত করেন এবং এক লাখ সদস্যের একটি 'মুজাহিদ বাহিনী' গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ৫ মার্চ তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান কেল্লা' থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে ১৯৪৭ সালের ১০ মার্চ সারা প্রদেশে 'আসাম দিবস' পালনের আহ্বান জানান। ৯ মার্চ মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের এক সভার প্রস্তাবে গণ-আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার কথা বলা হয়। এ উপলক্ষে প্রকাশিত প্রচারপত্রে বাংলা ও আসামের ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি আসামের সকল খাস ও অব্যবহৃত জমি দখল করে নেয়ার এবং সরকারি আইন অমান্য করার আহবান জানানো হয়। নতুন পর্যায়ের এই আন্দোলন আসামের রাজনীতিতে মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেস সরকার একের পর এক স্থানে ১৪৪ ধারা প্রবর্তন করতে থাকে আর অন্যদিকে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, ১৯৪৭ সালের ১০ মার্চ প্রয়োজনে ১০ হাজার কর্মীসহ তিনি স্বয়ং গ্রেফতার বরণ করবেন। পরিস্থিতির খুব দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে।

'আসাম দিবস' ও গ্রেফতার

লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনের পরিণত সে পর্যায়ে ১৯৪৭ সালের ১০ মার্চ 'আসাম দিবস' পালনের জন্য মওলানা ভাসানীর আহবান একটি বিশেষ কারণে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। গোয়ালাপাড়া জেলার মানকাচরের নিকটবর্তী বারবান্দায় স্থাপিত 'পূর্ব পাকিস্তান কেল্লা' থেকে ঘোষিত কর্মসূচিতে মওলানা

ভাসানী এই উপলক্ষে সকল খাস জমি দখল করে চাষাবাদ আরম্ভ করার জন্য বাংলা ও আসামের ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। ১৪৪ ধারাসহ নিবর্তনমূলক সরকারি আইন অমান্যেরও ডাক দিয়েছিলেন তিনি। আন্দোলনকালে প্রয়োজনে গ্রেফতার বরণের জন্য ১০ হাজার কর্মীর সমন্বয়ে বিরাট এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রস্তুত রাখার কথাও ঘোষণা করা হয়েছিল। মওলানা ভাসানীর এই সর্বাত্মক আন্দোলনের প্রস্তুতি এবং কর্মসূচি স্বাভাবিকভাবেই আসামে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। সরকার এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল, প্রচলিত আইন অমান্য করা হলে তা কোনো অবস্থাতেই সহ্য করা হবে না এবং এ উদ্দেশ্যে পরিচালিত যে কোনো আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে কঠোর হস্তে দান করা হবে।

সরকারি হুমকি উপেক্ষা করেই মওলানা ভাসানী প্রস্তাবিত আসাম দিবসের আন্দোলন এগিয়ে নিয়েছিলেন। 'দেশবাসীর প্রতি আমার শেষ আবেদন' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে গরিব ও ভূমিহীন কৃষকদের মুক্তির জন্য সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার আহবান জানিয়ে তিনি একে নিজেদের 'অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। মওলানা ভাসানীর ভাষায় সে সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল জমিসহ মৌলিক অধিকার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের নিশ্চয়তা অর্জন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও আসামের প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্য 'জেহাদ' পরিচালনা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১০ মার্চ সারা আসাম প্রদেশে পালিত হয়েছিল 'আসাম দিবস'। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মওলানা ভাসানী সেদিন তেজপুর টাউন হলে আয়োজিত 'আসাম দিবস'-এর সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণে তিনি ইংরেজদের বিতাড়ন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, জমিদারি প্রথার বিলোপ, লাইন প্রথা বাতিল এবং উচ্ছেদকৃত বাঙালী কৃষকদের জমিতে পুনর্বাসনসহ অহমীয় ও বাঙালী নির্বিশেষে সকল ভূমিহীনকে জমি প্রদানের দাবি জানিয়েছিলেন। সরকারের ভাষায় তাঁর এই ভাষণ ছিল উসকানিমূলক এবং আপত্তিকর, আর সেজন্যই সেদিন সমাবেশ শেষে পূর্বঘোষিত বিক্ষোভ মিছিলকে সরকার নিষিদ্ধ করেছিল। শুধু তা-ই নয়, ভাষণের পরপর তেজপুর টাউন হল থেকেই গ্রেফতার করা হয়েছিল মওলানা ভাসানীকে।

গ্রেফতারের এই ঘটনা সমগ্র আসামে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল। মুসলিম লীগ নেতা-কর্মীরা ছাড়াও বিশেষ করে পূর্ব বাংলা থেকে আগত বাঙালী কৃষকরা এত বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে, আসামের কংগ্রেস সরকার রীতিমতো 'আক্রমণ'-এর আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলুই সে অবস্থায় আপসের কৌশল অবলম্বন করেন এবং মুসলিম লীগের প্রতি আলোচনা বৈঠকে মিলিত হওয়ার আহবান জানান। মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতির চমৎকার

সুযোগ নিয়ে স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহ নিজেকে আন্দোলনের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করে নেন এবং বন্দী নেতার মুক্তির ব্যবস্থা করার কিংবা আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তিনি বড়দলুই সরকারের সঙ্গে দিনের পর দিন আলোচনা চালাতে থাকেন। সাদুল্লাহ ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটি মনোনীত প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান। আর সে কারণে তার সিদ্ধান্ত অমান্য করে আন্দোলনকে শক্তিশালী করা কর্মীদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

'বিচক্ষণ' প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলুই-এর নেতৃত্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার এভাবেই সেবার লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতিকে প্রতিহত করেছিল। স্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহ আলোচনার টেবিলে যোগ দেয়ায় এবং তার নির্দেশ অমান্য করার মতো কোনো নেতা না থাকায় চলমান প্রচণ্ড সে আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। হতাশায় ঘরে ফিরে গিয়েছিল জঙ্গি কৃষক ও কর্মীরা। এমন একটি অবস্থার জন্য প্রতীক্ষায় থাকা গোপীনাথ বড়দলুই ভীতিমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোচনা ভেঙে দিয়েছিলেন। প্রত্যাখ্যাত সাদুল্লাহ তখন নতুনভাবে আন্দোলন সূচনার আহবান জানিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালের ২৯ এপ্রিল। কিন্তু পরিস্থিতি ততোদিনে অনেক প্রতিকূল হয়ে গেছে এবং বড় কথা, ক্ষমতালোভী হিসেবে পরিচিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লাহর প্রতি সংগ্রামী নেতা-কর্মী এবং জনগণের সামান্য আস্থাও ছিল না। ফলে তার আহবানে কোনো সাড়া মেলেনি, লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনও আর কোনোদিন শক্তি অর্জন করতে পারেনি ব্রিটিশ ভারতের আসামে।

ওদিকে জোড়হাট কারাগার থেকে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন মওলানা ভাসানী মুক্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষেও নতুন পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। কারণ, এরই মধ্যে ৩ জুন ঘোষিত হয়েছিল ভারত বিভাগের পরিকল্পনা এবং এতে আসামকে প্রস্তাবিত পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল। এরপর ১৮ জুলাই 'ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট' ঘোষণার পাশাপাশি সুনির্দিষ্টভাবে পাকিস্তানের অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করেছিল ব্রিটিশ সরকার। আসাম পাকিস্তানের ভাগে না পড়ায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানীর আহবানেরও আর গুরুত্ব ছিল না। ফলে প্রবাসী বাঙালীদের স্থায়ী ক্ষতির কারণ ঘটিয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই লাইন প্রথা বিরোধী দীর্ঘ প্রায় দুই দশকব্যাপী পরিচালিত আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটেছিল।

লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনে সাফল্য ও ব্যর্থতা

অনভিপ্রেত এই পরিণতি সত্ত্বেও মওলানা ভাসানীর আন্দোলন বাঙালী এবং গরিব ও ভূমিহীন অহমীয় কৃষকদের মঙ্গল বিধানে অবদান রেখেছিল, আংশিকভাবে হলেও নিশ্চিত করেছিল তাদের অধিকার। লাইন প্রথার প্রাথমিক বিধানে প্রবাসী

বাঙালীদের কোনো রকম অধিকারই স্বীকৃত ছিল না, ছিল না এমনকি উচ্ছেদের আগে কোনো পূর্ব-বিজ্ঞপ্তির ব্যবস্থাও। এর ফলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে বাঙালীদের উচ্ছেদ করা যেতো এবং এই সুযোগে ১৯২০-এর দশক থেকেই ক্রমশ উচ্ছেদ অভিযান প্রবলতর হয়েছিল। কিন্তু মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলনের সাফল্য বাঙালীদের জন্য আইনসঙ্গত ভিত্তির স্বীকৃতি আদায় করেছিল। ১৯৪৫ সালের সংশোধিত বিধানে বলা হয়েছিল, ১৯৩৮ সালের ১ জানুয়ারির আগে আগত বাঙালীদের আসামের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করা হবে। এ ছিল আন্দোলনের এক বিরাট বিজয়। এরই পাশাপাশি যে কোনো এলাকায় উচ্ছেদের আগে অন্তত এক মাসের বিজ্ঞপ্তি দেয়ার বিধানও সংযোজিত হয়, যা বাঙালীদের চরম অনিশ্চয়তা থেকেই কেবল রক্ষা করেনি, তাদের সম্পদ রক্ষারও ব্যবস্থা করেছিল। কেননা, তার আগে পর্যন্ত বিনা বিজ্ঞপ্তিতে উচ্ছেদের কারণে তারা এমনকি হাড়ি-পাতিলের মতো নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র পর্যন্ত সরানোর সুযোগ পেতো না, সবকিছু আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হতো। ঘরবাড়িও গুঁড়িয়ে দেয়া হতো হাতির পাল দিয়ে।

এই প্রেক্ষাপটে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মওলানা ভাসানীর লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি; বরং ভারত বিভাগের সময় ঘনিয়ে না এলে আন্দোলন তার চূড়ান্ত লক্ষ্যও অর্জন করতে পারতো। এ প্রসঙ্গে আন্দোলনের ব্যর্থতার দিকটির প্রতি লক্ষ্য করা দরকার। একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র পূর্ব বাংলা থেকে আসামে আগত বাঙালী কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং জমিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এতে অহমীয়দের কোনো স্বার্থ ছিল না; বরং অন্য অর্থে এটা ছিল তাদের স্বার্থবিরোধী। পরিণতির এই দিকটিকেই ইংরেজদের পাশাপাশি কংগ্রেস সরকারও প্রকাশ্যে প্রচার করতো। সাধারণ অহমীয়রাও এ প্রচারণায় স্বাভাবিকভাবে বিভ্রান্ত হতো। প্রতিকূল সে অবস্থায় মওলানা ভাসানীকে সতর্ক কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছিল। আন্দোলনকে সর্বাত্মক রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি একে সম্পূর্ণ কৃষক আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন। বাঙালী এবং অহমীয় নির্বিশেষে তিনি কৃষক মাত্রের দাবিসমূহকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন এবং তার ভিত্তিতে গোটা কৃষক সমাজকে টেনে এনেছিলেন আন্দোলনে। ভূমিহীন ও গরিব কৃষককে জমি প্রদান এবং জমিদারি প্রথা বিলোপের জন্য উত্থাপিত তাঁর আন্তরিক দাবি কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এর ফলেই সাফল্যের পথে আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সে সাফল্যই আবার অন্যদিক থেকে আংশিক ব্যর্থতার কারণও ঘটিয়েছিল। ১৯৩৮ সালের ১ জানুয়ারির আগে আগতদের অধিকার স্বীকৃত হওয়ার পর সেই বাঙালী কৃষকদের গরিষ্ঠ অংশ স্বার্থপরতার সঙ্গে আন্দোলন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছিল। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সামগ্রিক আন্দোলন, শক্তি হারিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী।

রাজনৈতিক দল হিসেবে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগও আন্দোলনের সকল পর্যায়ে মওলানা ভাসানীর সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। আসামের নাগরিক স্যার মুহাম্মদ সাদুল্লাহ প্রধানমন্ত্রিত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। তিনিও আন্দোলন দমন করতেই এগিয়েছিলেন। সে পর্যায়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের হস্তক্ষেপ মওলানা ভাসানীর সহায়ক হতে পারতো। বড়পেটা সম্মেলনে মামদোতের নবাব এবং কাজী মোহাম্মদ ঈসাকে মধ্যস্থতার জন্য পাঠিয়ে তেমন একটি ভূমিকা পালনের উদ্যোগও নিয়েছিল মুসলিম লীগ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাদুল্লাহ বিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়ায় পরবর্তীকালে ওই উদ্যোগ মুসলিম লীগের অভিনয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। কেননা, ভাসানী-সাদুল্লাহ বিরোধের সময়কালে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সেক্রেটারি এবং পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান একাধিকবার আসাম সফরে এসেছিলেন। প্রতিবার তিনি লাইন প্রথা বিরোধী চলমান আন্দোলনের সমর্থনে বিবৃতিও দিয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালের মে'র প্রথম দিকে তিনি বলেছিলেন, 'আসামে প্রবাসী মুসলমানদের ওপর সরকারি নির্যাতন এখন নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার সকল সীমা অতিক্রম করে গেছে।' (শিলং টাইমস, ১০ মে ১৯৪৬) অথচ লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ কমিটি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল অব অ্যাকশন-এর চেয়ারম্যান হিসেবে স্যার সাদুল্লাহকেই নিযুক্তি দিয়েছিল। ক্ষমতার এই পদমর্যাদা ব্যবহার করেই সাদুল্লাহ মওলানা ভাসানীর গ্রেফতার-পরবর্তী দিনগুলোতে চলমান প্রচণ্ড আন্দোলনকে বড়দলুই-এর আলোচনার টেবিলে নিয়ে গিয়ে নস্যাৎ করেছিলেন।

মাওলানা ভাসানীর অর্জন ও মূল্যায়ন

অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের এই সাদুল্লাহপ্রীতি কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না। প্রধান দু'টি কারণে মুসলিম লীগ নেতারা মওলানা ভাসানীর সমর্থনে এগিয়ে আসেননি : **এক.** রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য; এবং **দুই.** অত্যাসন্ন ভারত বিভাগের পরিপ্রেক্ষিত। বস্তুত সাদুল্লাহ এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের শ্রেণী অবস্থান, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ছিল প্রায় একশ' ভাগ মিল। তাদের কেউ মেহনতী কৃষক-জনতার সত্যিকার মুক্তির জন্য সংগঠন বা আন্দোলন করতেন না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল পৃথক একটি রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা দখল করা। ফলে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ায় এবং সে পরিকল্পনায় আসাম পাকিস্তানের ভাগে না পড়ায় মুসলিম লীগ নেতারা প্রদেশটির অধিবাসীদের ভাগ্যের প্রশ্নে সামান্য আগ্রহ দেখাতেও রাজি হননি। তারা বরং ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন 'যা পাওয়া গেছে' তা-ই নিয়ে। এর প্রমাণ, আসাম দূরে থাকুক, তারা এমনকি কলকাতার মতো শত বছরের প্রাচীন একটি রাজধানী শহরকেও ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন করাচী এবং লাহোরসহ পশ্চিম পাকিস্তান পাওয়ার স্বার্থে।

ওদিকে শ্রেণী অবস্থানের পাশাপাশি সাদুল্লাহর মধ্যে ছিল আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ চিন্তাধারা। মওলানা ভাসানীর মতো একজন 'বহিরাগত' নেতা আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি হওয়ায় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাছাড়া ক্ষমতার ব্যাপারে অনাগ্রহী এবং প্রধানত কৃষকের দাবিমুখে অগ্রসরমান ভাসানী নিজেও সরাসরি বিরোধিতার মধে দিয়ে সাদুল্লাহর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ফলে আন্দোলনকে সফল করার চেয়ে এর নস্যাতের মধ্যেই ছিল সাদুল্লাহর ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের বেশি সম্ভাবনা। তিনি পদক্ষেপও নিয়েছিলেন সে লক্ষ্যে। ক্ষমতাসীন থাকার সময় তো বটেই, এমনকি তারপরও তার ছুরিকাঘাত বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সবশেষে ১৯৪৭ সালের মার্চে 'আসাম দিবস'-উত্তর দিনগুলোতে সাদুল্লাহ এমন এক সময়ে পিছুটান দিয়েছিলেন যখন সামান্য চেষ্টাতেই তিনি আন্দোলনকে দুর্বার গতিবেগ দিতে পারতো, পারতেন। পারতেন চূড়ান্ত সাফল্য ছিনিয়ে আনতেও।

গ্যার মোহাম্মদ সাদুল্লাহর এই ভূমিকার ফলে আসাম মুসলিম লীগেও অনানুষ্ঠানিক বিভক্তি এসেছিল। বিশেষ করে আসামের মুসলমানরা সরে গিয়েছিল আন্দোলন থেকে। সেই সঙ্গে অধিকারপ্রাপ্ত বাঙালীরাও পিছুটান দেয়ায় এবং ঠিক মাঝপথে নিজে গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় মুক্তিলাভের পর আর মওলানা ভাসানীর পক্ষে বিপর্যস্ত আন্দোলনকে দাঁড় করানো আর সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, আগেই বলা হয়েছে, ভারত বিভাগের ঘোষণাও এসেছিল একই সময়ে। তথাপি মওলানা ভাসানীর সাফল্য এখানেই যে, কয়েক লাখ বাঙালী কৃষককে তিনি আসামে অধিকার ও সমৃদ্ধিসহ প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছিলেন। সেই সঙ্গে সিলেট জেলার পাকিস্তানভুক্তির কথাও মনে রাখতে হবে। এ ছিল এককভাবে মওলানা ভাসানীর প্রচেষ্টার ফল।

লাইন প্রথা বিরোধী দুই দশকের এই আন্দোলন মওলানা ভাসানীর জন্য শিক্ষার অনেক উপাদান নিয়ে এসেছিল। শ্রেণী চেতনাসহ অন্য কোনো প্রসঙ্গে না গিয়ে শুধু একটি বিষয়ে বলা যায়, আসামের আন্দোলন থেকে তিনি এই শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, সত্যিকারভাবে আন্দোলন এগিয়ে নিতে হলে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই আলোচনার টেবিলে যাওয়া চলবে না। কারণ, ক্ষতাসীনরা মেহনতী মানুষের মুক্তির সংগ্রামকে নস্যাতের লক্ষ্যে গোলটেবিলকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন এবং আলোচনার নামে কালক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বিভ্রান্ত জনগণকে সাফল্যের সঙ্গে হতাশার অন্ধকারে ঠেলে দেন। গোপীনাথ বড়দলুই এবং সাদুল্লাহর মধ্যকার বৈঠক ছিল মওলানা ভাসানীর জন্য এ সম্পর্কিত বিশেষ উদাহরণ। কারণ, সাফল্যের নিকটবর্তী আন্দোলনকেও স্যার সাদুল্লাহ থামিয়ে দিয়েছিলেন, নিয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী বড়দলুই-এর আলোচনার টেবিলে। এর ফলে বছরের পর বছর ধরে বিকশিত লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। বিষময় এ ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে দাবি আদায়ের প্রশ্নে মওলানা ভাসানী কখনো শাসকদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে যাননি। তিনি সঠিকভাবে লক্ষ্য করেছিলেন, চলমান কোনো আন্দোলন দমনে ব্যর্থ শাসকরা আন্দোলন নস্যাতের কৌশল হিসেবেই আলোচনার ফাঁদ পাতেন। ফলাফলের দিকে আশায় তাকিয়ে থাকে আন্দোলনে অংশ নেয়া মানুষেরা, আর এর ফলে দ্রুত স্তিমিত হয়ে আসে আন্দোলনের প্রচণ্ডতা। সবশেষে আলোচনা ভেঙে দেয়ার জন্য এমন একটি সময়কেই বেছে নেয়া হয়, যখন আর আন্দোলনকে আবারও শক্তিশালী করে তোলার মতো অবস্থা থাকে না।

শাসকদের এই সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ মওলানা ভাসানী মনে করতেন, যে কোনো আন্দোলনের দাবি বা কর্মসূচি থাকে প্রকাশ্যে ঘোষিত, মিছিল ও সমাবেশের মাধ্যমে সেগুলোর যৌক্তিকতাও ব্যাখ্যা করা হয়। আর তাই দাবি মানা-না মানার প্রশ্নে আলোচনার জন্য টেবিলে যাওয়ার মধ্যে মানুষের জন্য মঙ্গল নিহিত থাকতে পারে না। দাবির যৌক্তিকতাকে নীতিগতভাবে স্বীকার করার পাশাপাশি সেগুলো মেনে নেয়ার ঘোষণা দিলেই কেবল বাস্তবায়নের পন্থা সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। সে অবস্থার আগে ডাকা আলোচনার উদ্দেশ্যের ভেতরে যেমন শাসকদের ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য থাকে, তেমনি ক্ষতিকর চিন্তা থাকে যোগদানকারী নেতাদের মনেও। উভয় পক্ষই আসলে আন্দোলনকে নস্যাৎ করার চিন্তাচালিত হয়। কিন্তু সবচেয়ে বিপজ্জনক ভূমিকাটুকু পালন করেন বিরোধী দলের নেতারা। কেননা তাদের জন্যই জনগণ বিভ্রান্ত হয়।

দৈনিক যায়যায়দিন-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত; মে, ২০০৭

পাকিস্তানের প্রাথমিক আন্দোলন

পাকিস্তানের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানী কেন সরকার এবং মুসলিম লীগ বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন তা জানার জন্য ইতিহাস পর্যালোচনা করা দরকার। দেখা যাবে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা বাঙালী বা পূর্ব বাংলাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে, অন্তত সমমর্যাদার ভিত্তিতে গ্রহণ করেননি। বাঙালীর কোনো প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসতে না দেয়ার সিদ্ধান্তটি তারা সুচিন্তিতভাবেই নিয়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পাশাপাশি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাবেক সেক্রেটারি আবুল হাশিমসহ অবিভক্ত বঙ্গ বা বাংলার নেতাদের প্রতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খানদের অবিচার এর প্রমাণ। ভারত বিভাগকালে তারা এমন এক নীতি অবলম্বন করেছিলেন, যাতে প্রদেশ হিসেবে পূর্ব বাংলা সমৃদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ না হতে পারে। তাদের মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল কলকাতার প্রশ্নে। ভারতের প্রাচীন এই রাজধানী শহরটির বিনিময়ে জিন্নাহ-লিয়াকত আলীরা করাচী এবং লাহোরের মতো শহরগুলোকে 'বিনামূল্যে' পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনে পার্টিশন কাউন্সিল থেকে শেরে বাংলা ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রত্যাহার করানো হয়েছিল। অথচ এই কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বাংলার ইংরেজ গভর্নর স্যার আর জি ক্যাসির সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর সমঝোতা হয়েছিল, কলকাতাকে পূর্ব বাংলার ভাগে যদি শেষ পর্যন্ত না দেয়া যায় তাহলে কলকাতা এবং দার্জিলিং শহর দুটিকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার 'কমন' বা যৌথ শহর হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং চব্বিশ পরগণার বারাকপুর, বারাসত, ভাঙ্গর ও বশিরহাট পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত হবে।

আসাম প্রদেশের প্রশ্নেও জিন্নাহ-লিয়াকত আলীরা ক্ষতিকর অবস্থানই নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সংশোধিত প্রস্তাবে আসামকে পূর্ব বাংলা তথা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাখার কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বেশি ব্যস্ত জিন্নাহ-লিয়াকত আলীরা আসামের ব্যাপারে সামান্যও আগ্রহ দেখাননি। সে অবস্থায় আসাম ভারতের অংশে চলে যায়, যদিও মওলানা ভাসানীর প্রচেষ্টায় সিলেট জেলাকে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানীর গড়ে তোলা দুর্বার আন্দোলনের চাপে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে সিলেটের প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন আসাম সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসন্ত কুমার দাসের মতে সর্বমোট প্রদত্ত দুই লাখ ৩৯ হাজার ৬১৯ ভোটের মধ্যে পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে পড়েছিল এক লাখ ৮৪ হাজার

৪১ ভোট। সিলেট জেলাকে পূর্ব বাংলায় নিয়ে আসার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মওলানা ভাসানীর, মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই রাখেননি। তারা বরং পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক প্রলোভনে গণভোটের বিজয় সত্ত্বেও সিলেটের করিমগঞ্জ মহকুমাকে শেষ মুহূর্তে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

বিভাগকালীন এই বঞ্চনার ফলে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বিষয়টি নিজেদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জিন্নাহ-লিয়াকত আলীদের সহায়ক হয়েছিল। কেননা, এর ফলে অবিভক্ত বাংলার দুই নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিম জন্মস্থানের কারণে পশ্চিম বাংলার ভাগে পড়েছিলেন, অন্যদিকে বরিশালের সন্তান হলেও ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে শেরে বাংলা ফজলুল হক ততোদিনে গুরুত্বহীন এক 'আহত সিংহে' পরিণত হয়েছিলেন। এ অবস্থারই সুযোগ নিয়ে ঢাকার অতি অনুগত নবাব খাজা নাজিম উদ্দিনকে পূর্ব বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী বানানো হয়, কলকাতার দৈনিক আজাদ সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁকে দেয়া হয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির পদ। এই দু'জনও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং সে বাস্তবতার কারণে কলকাতাসহ বিভিন্ন অঞ্চল ও প্রাপ্য অর্থ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় পূর্ব বাংলা।

টাঙ্গাইলের উপনির্বাচন এবং বিরোধিতার সূচনা

অন্য কথায় পঙ্গু এবং ক্ষতবিক্ষত এক পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। জনসংখ্যাভিত্তিক অধিকার, সমান মর্যাদা এবং গণতন্ত্রের অবাধ চর্চার সুযোগ দেয়া হলে বিভাগকালীন এই ক্ষতি হয়তো অনেকাংশে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হতো, কিন্তু এক্ষেত্রে জিন্নাহ-লিয়াকত আলীদের ভিন্নরকম পূর্ব পরিকল্পনা ছিল। প্রথম থেকেই তারা পাকিস্তানকে 'এক আল্লাহ, এক ধর্ম, এক দল এবং এক নেতার দেশ' হিসেবে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করেছিলেন। এর অর্থ ছিল 'জাতির পিতা' ও 'কায়েদে আযম' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগের বিরোধিতাকে নিষিদ্ধ করা। এখানেই শেষ নয়, জিন্নাহ-লিয়াকত আলীরা বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনগণের জন্য মুসলিম লীগের দরোজা বন্ধ করে দেন, মুসলিম লীগকে বন্দী করা হয় ঢাকার 'আহসান মঞ্জিল'-এর ভেতরে। নতুন সদস্য নেয়াও নিষিদ্ধ করেন জিন্নাহ-লিয়াকত আলীরা। এমনকি আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীকেও পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগে সাধারণ সদস্যপদ দিতে অস্বীকার করা হয়।

ক্ষমতাসীনদের সে সিদ্ধান্তের অনিবার্য পরিণতিতে পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক বিরোধিতার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে প্রধান নেতা হিসেবে প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন মওলানা ভাসানী। দীর্ঘ ২৩ বছর আসামে কাটানোর এবং জমিদার-মহারাজা বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে পূর্ব বাংলার সর্বত্র তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল, জমিদার-শোষিত সন্তোষে তিনি তাঁর নতুন

আবাস তৈরি করেছিলেন। প্রথমেই নতুন বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠন করার পরিবর্তে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ক্ষমতাসীনদের সিদ্ধান্ত বিরোধী নেতা ও কর্মীরা মুসলিম লীগকে সত্যিকার অর্থে জনগণের সংগঠনে পরিণত করার জন্য বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন। নতুন সদস্য গ্রহণ এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠানের দাবি ছিল এসবের মধ্যে প্রধান। কিন্তু গভর্নর জেনারেল ও 'জাতির পিতা' মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নির্দেশে খাজা নাজিম উদ্দিন এবং মওলানা আকরাম খাঁর নেতৃত্বাধীন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তার পূর্ব সিদ্ধান্তই বহাল রাখে। এর ফলে মওলানা ভাসানীকে প্রকাশ্য বিরোধিতায় নামতে হয়।

মুসলিম লীগের সঙ্গে মওলানা ভাসানীর প্রথম সংঘাত ঘটে টাঙ্গাইলের একটি উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে। মওলানা ভাসানীর দাবি ও জনপ্রিয়তাকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীনরা করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নীকে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। প্রতিবাদে এবং ক্ষমতাসীনদের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কর্মীদের চাপে মওলানা ভাসানী উপনির্বাচনে স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থী হন। মন্ত্রী এবং সরকারি প্রশাসনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, বিপুল অর্থ ব্যয় এবং গুণ্ডামি ও সন্ত্রাস সত্ত্বেও নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী খুররম খান পন্নীর পরাজয় ঘটে, মওলানা ভাসানী বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন।

ভাসানীর নির্বাচন বাতিল : এবার শামসুল হক

উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের এই পরাজয়ের অসম্মানজনক ঘটনাটি সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্ব এবং মুসলিম লীগের প্রভাব সেকালে ছিল প্রশ্নাতীত। তাদের বিরোধিতার অর্থই ছিল পাকিস্তানের বিরোধিতা এবং শাস্তি হিসেবে প্রকাশ্যেই তখন 'শির কুচল' করার তথা মাথা কেটে ফেলার হুমকি উচ্চারিত হতো। অমন এক প্রভাব ও হুমকির মধ্যেও সরকারের প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং মওলানা ভাসানীর বিজয় ক্ষমতাসীনদের কেবল ক্রোধান্ধই করেনি, ভীত-সন্ত্রস্তও করেছিল। তারা এর বিহিত করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন, নির্বাচনী ফলাফলকে বাতিল ঘোষণার অজুহাত খোঁজা শুরু হয়। ঘটনাক্রমে মওলানা ভাসানী নিজেই একটি অজুহাত তুলে দিয়েছিলেন। নির্বাচনী আইন অনুসারে প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচনে তার ব্যয়ের হিসাব পেশ করতে হতো। কিন্তু মওলানা ভাসানী তাঁর হিসাব পেশ করতে অস্বীকার করেন। তাঁর কারণ বা যুক্তি ছিল অবিশ্বাস্য ও কৌতূহলোদ্দীপক– নির্বাচনী ব্যয়ের সমুদয় অর্থই তিনি পেয়েছিলেন মুরিদ-ভক্তদের চাঁদা ও সাহায্য থেকে। তাঁর নিজের একটি টাকাও যেহেতু খরচ হয়নি, তিনি তাই হিসাব পেশ করার নামে মিথ্যার আশ্রয় নিতে রাজি হননি। সমর্থক এবং অনুসারীরা তাঁকে নামকাওয়াস্তে হলেও একটি হিসাব দাখিল করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু মওলানা ভাসানী সিদ্ধান্ত পাল্টাননি।

অমন একটি চমৎকার সুযোগ ক্ষমতাসীনরাও হাতছাড়া করেননি। বিজয়ী প্রার্থী তাঁর নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব পেশ করেননি– এই অভিযোগে মওলানা ভাসানীর নির্বাচনকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকারি আদেশে একই সঙ্গে পুরো উপনির্বাচনটিকেও অবৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলা হয়, মওলানা ভাসানী এবং জমিদার পত্নীসহ অংশগ্রহণকারী কোনো প্রার্থীই ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অন্য কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। সরকারি এই নির্দেশটিকে সাধারণভাবে উদার ও সংকীর্ণতা-মুক্ত মনে হলেও ক্ষমতাসীনরা অচিরেই এর বিপরীত অবস্থানে চলে গিয়েছিলেন। টাঙ্গাইলের একই এলাকায় দ্বিতীয়বারের মতো উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরপর সংশোধিত এক আদেশে বলা হয়েছিল, অযোগ্য ঘোষিতদের মধ্যে একমাত্র জমিদার পত্নী উপনির্বাচনে আবার প্রার্থী হতে পারবেন।

মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এবার প্রার্থী করা হয়েছিল টাঙ্গাইলের প্রগতিশীল যুবনেতা শামসুল হককে। চিন্তাধারার দিক থেকে মওলানা ভাসানী এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাবেক সম্পাদক আবুল হাশিমের অনুসারী শামসুল হক মেধাবী ছাত্র ও সংগ্রামী যুবনেতা হিসেবে আগেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার এই খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা বিশেষ করে টাঙ্গাইল মহকুমায় এত ব্যাপক ছিল যে, ক্ষমতাসীনদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দ্বিতীয় উপনির্বাচনে তিনিই জয়লাভ করেছিলেন, জমিদার খুররম খান পন্নীর আবারও ঘটেছিল লজ্জাকর পরাজয় (২৬ এপ্রিল, ১৯৪৯)।

পরাজয়ের এই ঘটনা প্রদেশের ক্ষমতাসীনদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। অচিরেই তারা নির্বাচনটিকে বাতিল ঘোষণা করেন। অজুহাত হিসেবে এবার তারা মওলানা ভাসানীর নামে প্রচারিত একটি প্রচারপত্রকে বেছে নিয়েছিলেন। উপনির্বাচনের প্রাক্কালে, ১৯৪৯ সালের মার্চে আসাম সফরে গেলে ভারত সরকার মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করেছিল। উপনির্বাচনের সময় তিনি আসামের কারাগারে বন্দী ছিলেন। বন্দী থাকাকালেই শামসুল হককে ভোট দেয়ার আহবান জানিয়ে মওলানা ভাসানী প্রচারপত্রটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। সে কারণে আইনত তাঁর স্বাক্ষরটি গ্রহণযোগ্য নয়, বরং সেটা জাল স্বাক্ষর– এই অভিযোগে ক্ষমতাসীনরা শামসুল হকের নির্বাচনকেও বেআইনি ঘোষণা করিয়েছিলেন।

শুরু থেকেই পূর্ব বাংলার বঞ্চনা

টাঙ্গাইলের একই এলাকার উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মনোনীত একই প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নীর পরপর দু'বার পরাজিত হওয়ার এই ঘটনা পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিষময় পরিণতির উপলক্ষ হয়েছিল। কারণ, গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা কিংবা সততার কোনো উপাদানই মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিল না, ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার স্বৈরাচারী মনোভাবই সে সময় তাদের চালিত করতো। উদ্দেশ্য ও মনোভাবের এই সংকীর্ণতার কারণে এরপর তারা পূর্ব বাংলায় অন্য কোনো আসনে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করেননি। ফলে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত

টাঙ্গাইলসহ প্রদেশে কোনো উপনির্বাচন হয়নি, যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে ১৯৫০-৫১ সালের মধ্যে নতুন নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছিল।

সে অবস্থায় 'হাতমে বিড়ি মুমে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগানের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিজয়ী ব্যক্তিরাই পাকিস্তানের গণপরিষদ এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ভারতের যুক্ত প্রদেশ থেকে আগত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং বেগম শায়েস্তা ইকরামউল্লাহসহ বেশ কয়েকজন অবাঙালী সদস্যকেও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব বাংলার অংশ থেকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, পূর্ব বাংলায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় পাকিস্তানের গণপরিষদেও পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়নি (গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনার জন্য)। ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট নির্বাচিত ৭৯ সদস্যের এই গণপরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৪৪ জন। কিন্তু লিয়াকত আলী খানদের মতো 'প্রতিনিধি'রা থাকায় ন্যাশনাল কংগ্রেসের ১১ জন অমুসলিম সদস্য ছাড়া অন্য কেউই পূর্ব বাংলা বা বাঙালীর পক্ষে কোনো ভূমিকা রাখেননি।

অন্য কথায় প্রাদেশিক পরিষদ এবং পাকিস্তান গণপরিষদের উভয় স্থানেই পূর্ব বাংলা সত্যিকার অর্থে প্রতিনিধিত্বহীন অবস্থায় ছিল। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ১৯৫২ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রশ্নে অনুষ্ঠিত বিতর্ক শেষে গণপরিষদের ভোট গণনায় দেখা গিয়েছিল, পাঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ত্রী সরদার শওকত হায়াত খান এবং সরদার আবদুল্লাহজান খান বাংলার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু প্রস্তাবের উত্থাপক বাঙালী নূর আহমদ স্বয়ং চলে গেছেন বাংলার বিপক্ষে। ফলে ৪১-১২ ভোটে বাতিল হয়ে যাওয়ায় বাংলাকে সেবার রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়নি। গণপরিষদের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের হস্তক্ষেপের ফলেই উত্থাপক হয়েও নূর আহমদ বাংলার বিরুদ্ধে ভোট দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯৪৮ সালের। সে বছরের মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীদের সভায় পূর্ব বাংলার রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস সেলস ট্যাক্স বা বিক্রয় করের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কেন্দ্রকে দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। বিক্রয় কর সম্পর্কিত এই সিদ্ধান্ত প্রাথমিকভাবে দুই বছরের জন্য নেয়া হলেও ১৯৫২ সালের 'রেইসম্যান অ্যাওয়ার্ড' বা রেইসম্যান রোয়েদাদ-এর সুপারিশ অনুসারে ব্যবস্থাটিকে স্থায়ী করা হয়। পূর্ব বাংলার জন্য এর ফলাফল অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছিল। পরবর্তীকালের সে আলোচনায় না গিয়ে আপাতত কেবল এটুকুই বলা যায়, পূর্ব বাংলার স্বার্থ বিরোধী এই সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপগুলো নেয়ার এবং বাস্তবায়নের কোনো পর্যায়েই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা কিংবা গণপরিষদের অনুমোদন নেয়া হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে কখনো কখনো বিষয়গুলোকে আলোচ্যসূচিতে রাখা হলেও মূল

বা প্রধান বিষয়ের মতো গুরুত্ব দেয়া হয়নি, সদস্যরাও কথা বলার যথাযথ সুযোগ বা অধিকার পাননি। সবচেয়ে বড় কথা, সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং নূর আহমদের মতো বাঙালীর সত্যিকার 'প্রতিনিধি'!

অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই পূর্ব বাংলাকে সকল দিক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। বিশেষ করে পরিষদ দুটিতে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে বাঙালীরা ছিল অত্যন্ত অসহায়। এর পেছনের প্রকৃত কারণ ছিল টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের পরপর দু'বার পরাজয়ের ঘটনা। এই পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ গণতন্ত্রের অবাধ চর্চার পথকে রুদ্ধ করেছিল, কিন্তু তাদের সে অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তই অন্যদিকে খুলে দিয়েছিল বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠনের পথ। বস্তুত সর্বস্তরের তথা সাধারণ মানুষের সংগঠন হিসেবে ১৯৪৯ সনের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের শেকড় প্রোথিত ছিল টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনের মধ্যে। আর ঘটনাক্রমে বিজয়ী দুই প্রার্থী মওলানা ভাসানী এবং শামসুল হকই নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রথম সে বিরোধী দলটির প্রথম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে।

আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। এটাও মুসলিম লীগই ছিল, কিন্তু ছিল 'আওয়ামের' অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মুসলিম লীগ। এজন্যই নাম দেয়া হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। নির্বাচিত তিনজন সহ-সভাপতি ছিলেন আতাউর রহমান খান, সাখাওয়াত হোসেন এবং আলী আহমদ খান; যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন খন্দকার মোশতাক আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমান। সহ-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে এ কে এম রফিকুল হোসেন ও ইয়ার মোহাম্মদ খান। মওলানা ভাসানীর আহবানে অনুষ্ঠিত 'রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন'-এর মধ্য দিয়ে সেদিন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছিল। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের নির্যাতন নিশ্চিত জেনেও সম্মেলনের জন্য স্থান দিয়েছিলেন কে এম বশীর। তার কে এম দাস লেনের বাসভবন 'রোজ গার্ডেন'-এর হল ঘরে প্রায় তিন শ' প্রতিনিধির ঐতিহাসিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং 'লাহোর প্রস্তাব'-এর উত্থাপক শেরে বাংলা ফজলুল হক এই সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ হারানোর ভয়ে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করেননি।

'এক ধর্ম, এক দল এবং এক নেতার দেশ' হিসেবে বর্ণিত পাকিস্তানের সরকার কিংবা মুসলিম লীগের যে কোনো বিরোধিতাকেই সে সময় রাষ্ট্রদ্রোহিতারূপে বিবেচনা করা হতো, বিরোধিতাকারীদের 'হিন্দুস্থানের দালাল' হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। এই অভিযোগে 'শির' কেটে ফেলার হুমকিও উচ্চারিত

হতো প্রকাশ্যে। অমন এক সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার মতো দুর্দান্ত সাহসী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে মওলানা ভাসানী একটি দলই কেবল গঠন করেননি, এতদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে চলমান আন্দোলনের ধারাগুলোকেও সংহত ও সমন্বিত করেছিলেন। একযোগে তিনি অধিকার আদায়ের ভবিষ্যত সংগ্রামের জন্য নির্মাণ করেছিলেন সুদৃঢ় ভিত্তিও।

বস্তুত এই সময়কাল পর্যন্ত একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে ন্যাশনাল কংগ্রেস তার দুর্বল ভূমিকা পালন করে আসছিল। পাকিস্তানের গণপরিষদে দলটির ১১ জন সদস্য থাকলেও চরম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ সেই দিনগুলোতে 'মুসলমানদের জন্য' গঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের বিরোধিতাকে সহজেই ভারতের উসকানি এবং অনুচরবৃত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতো। এর ফলে কংগ্রেসের পক্ষে ফলপ্রসূ কোনো অবদান রাখা সম্ভব হয়নি। চাপের মুখে কংগ্রেস নেতারা সব সময় অবদমিত অবস্থায় থাকতেন, ভীত থাকতেন নিরাপত্তার অভাবে। অনেককে দেশত্যাগ করে ভারতেও চলে যেতে হতো। এভাবে বিশেষ করে ১৯৫০-এর দাঙ্গার পর সকল নেতা ভারতে চলে যাওয়ায় দল হিসেবে ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিল।

একটি বিরল ভাষণ

শক্তিশালী বিরোধী দলের অনুপস্থিতির চমৎকার এ সুযোগ নিয়েছিল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ। রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করার পাশাপাশি বাঙালী জনগোষ্ঠীর প্রতি শাসন, শোষণ এবং অত্যাচার-অবহেলার সুচিন্তিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে অবাধে এগিয়েছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়করা। তাদের নির্দেশে খাজা নাজিম উদ্দিন এবং মওলানা আকরাম খাঁসহ পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগকে নিয়ে গিয়েছিলেন আহসান মঞ্জিলের অভ্যন্তরে। মুসলিম লীগের দ্বার বন্ধ হয়েছিল জনগণের জন্য। আগেই বলা হয়েছে, আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীকেও সাধারণ সদস্য হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি।

পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনদের এই স্বেচ্ছাচারী কার্যক্রমের মুখে স্বাভাবিকভাবেই অসহায় হয়ে পড়েছিল পূর্ব বাংলার জনগণ। প্রতিবাদবিহীন সে অবস্থার সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনরা বাঙালীদের শোষণের সূচনা করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় অন্যতম প্রাথমিক পদক্ষেপ ছিল প্রদেশের বিক্রয় করের ওপর কেন্দ্রের অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' এবং গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীদের এক সভায় প্রাদেশিক রাজস্বের প্রধান উৎস বিক্রয় করের শতকরা ৫০ ভাগ কেন্দ্রকে দেয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। সিদ্ধান্তটি প্রাথমিকভাবে দু' বছরের জন্য নেয়া হলেও ১৯৫২ সালের রেইসম্যান রোয়েদাদ-এর সুপারিশক্রমে ব্যবস্থাটিকে স্থায়ী করা হয়েছিল। একই সঙ্গে আয়কর এবং পাট রফতানির শুল্ক থেকেও বঞ্চিত করা হতে থাকে পূর্ব বাংলা। এর ফলে পূর্ব বাংলার যে বিপুল ক্ষতি হয়েছিল, তার

একটি উদাহরণ প্রসঙ্গত দেয়া যায়। ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫১-৫২ সালে পাট শুল্ক খাতে প্রদেশের আয় ছিল যথাক্রমে ছয় কোটি ৭২ লাখ এবং ছয় কোটি টাকা; কিন্তু 'রেইসম্যান রোয়েদাদ'-এর পর ১৯৫২-৫৩ ও ১৯৫৩-৫৪ সালে এই পরিমাণ কমে দাঁড়ায় যথাক্রমে চার কোটি ৩২ লাখ এবং চার কোটি টাকায়। (দ্রষ্টব্যঃ হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র'-এর প্রথম খণ্ড, নভেম্বর, ১৯৮২; পৃ. ৬১৫-২২)

হিসাবটি পরবর্তীকালের হলেও বঞ্চনার এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্বয়ং ছিলেন এর উদ্যোক্তা। বাঙালীর প্রতি পাকিস্তানী রাষ্ট্রনায়কদের শোষণমুলক নীতি-আচরণের বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদে প্রথমে সোচ্চার হয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় বাজেটের ওপর বিতর্কে অংশ নিতে গিয়ে দেয়া এক বিরল ভাষণে তিনি বলেছিলেন, '... প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট এই যে সেলস ট্যাক্স সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে চুক্তি করে দিয়ে আসলেন এবং তাদের কাছ হতে মাত্র এক কোটি টাকা নিবেন বলে স্বীকৃত হলেন, এটা মন্ত্রীমন্ডলী কোন স্বাধীনতার বলে করলেন? অ্যাসেম্বলীর মেম্বারদের সঙ্গে পরামর্শ না করে তারা নিজেরা মোড়লী করলেন কোন অধিকারে? আমরা কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গোলাম? ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গোলামী করি নাই। ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য চিরকাল লড়াই করেছি, আজও করব। আমরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে পাট উৎপাদন করব অথচ জুট ট্যাক্স এমনকি রেওলওয়ে ট্যাক্স, ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স নিয়ে যাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। এই সব ট্যাক্সের শতকরা ৭৫ ভাগ প্রদেশের জন্য রেখে বাকি অংশ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে দেওয়া হোক।....' (দেখুন : প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৩-৭৫)

বাঙালীর স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল নয়, সংসদীয় বিতর্ক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দিক থেকেও মওলানা ভাসানীর এ ভাষণটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। কারণ, পাকিস্তানী শোষণের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার তৎকালীন পার্লামেন্ট তথা ব্যবস্থাপক সভায় এ বক্তব্য রেখেছিলেন এবং এটাই ছিল তাঁর সর্বশেষ ভাষণ। এর ক'দিনের মধ্যেই তাঁর সদস্য পদ কেড়ে নেয়া হয়েছিল। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা দরকার যে, মুসলিম লীগের সদস্য পদ পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর থেকেই মওলানা ভাসানী ব্যক্তিগত উদ্যোগে সরকার বিরোধী ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় টাঙ্গাইলের শূন্য একটি আসনের উপনির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নেন। আগেই বলা হয়েছে, তিনি মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী জমিদার খুররম খান পন্নীকে হারিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচিত সদস্য হিসেবেই মওলানা ভাসানী ব্যবস্থাপক সভায় ভাষণটি দিয়েছিলেন।

জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি দাবি

মওলানা ভাসানী এই ভাষণে সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, তাঁর আক্রমণের সরাসরি শিকার হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম

উদ্দিন এবং অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীসহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্ষমতাসীন নেতারা। সরকার বিরোধী এই ভূমিকার ফল অবশ্য শুভ হয়নি, কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে মওলানা ভাসানীর বক্তব্যের দু' একটি বিশেষ দিক লক্ষ্য করা দরকার। পূর্ব বাংলার স্বার্থকে কেন্দ্র করে দেয়া ওই ভাষণে তিনি কৃষকদের দুর্দশার বর্ণণা দিতে গিয়ে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি জানিয়েছিলেন। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষা খাতে আরো বেশি ব্যয় বরাদ্দের দাবি জানিয়ে তিনি পুলিশের খাতে অত্যধিক ব্যয় বরাদ্দেরও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। উল্লেখ্য, এই সময় শিক্ষা খাতে মাত্র দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, অন্যদিকে পুলিশের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল তিন কোটি তিন লাখ ৭৭ হাজার টাকা।

অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী উত্থাপিত বাজেটের কঠোর সমালোচনা করে মওলানা ভাসানী আরো বলেছিলেন, 'মাননীয় অর্থসচিব সাহেব সেদিন বলেছেন যে, জমিদারি প্রথা তাড়াতাড়ি উচ্ছেদ করলে এক কোটি লোক মারা যাবে বা তাদের জীবন বিপন্ন হবে (তখন মন্ত্রীদের সেক্রেটারি বা সচিব বলা হতো)। তার ফিগার বুঝতে পারলাম না। পূর্ব বাংলায় মোট ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন কৃষিজীবী। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করলে এক কোটি লোক কি করে মারা যায়? এটা তিনি কি করে আবিষ্কার করলেন? গরীব কৃষকদের উপর জুট লাইসেন্স ফী বাবদ ২০ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু আপনারা জেনে অবাক হবেন যে, এই প্রদেশে জমিদারদের কাছে ২ কোটি টাকার চেক বাকি আছে। যে সমস্ত গরীব কৃষক কৃষিঋণ নিয়েছে এবং শোধ করতে পারছে না, মাননীয় অর্থসচিব সার্টিফিকেট দ্বারা তাদের বাড়ীঘর নিলাম এবং জোতজমি ক্রোক করলেও প্রবল প্রতাপশালী জমিদারদের হাতে কড়া লাগিয়ে ২ কোটি টাকার বাকি চেক আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারেননি। এই হাউসে অনেক মিনিস্টারের কাছেও লক্ষ লক্ষ টাকার চেক বাকি পড়ে আছে।...'

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ১৭ মার্চের (১৯৪৮) অধিবেশনেও মওলানা ভাসানী সরকার বিরোধী বক্তব্য রেখেছিলেন। এতে ইংরেজির পরিবর্তে তিনি বাংলা ভাষা ব্যবহার করার দাবি জানিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার স্বার্থে তাঁর এই দাবি এবং জমিদার-ভূস্বামী ও ধনিকদের সংগঠন মুসলিম লীগের শাসনামলে জমিদারি প্রথার প্রবল বিরুদ্ধাচরণ ক্ষমতাসীনদের ক্ষিপ্ত করেছিল। অচিরেই তারা মওলানা ভাসানীকে পরিষদের সদস্য পদ থেকে বিতাড়িত করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। নির্বাচনী এক মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি নির্বাচনী ব্যয়ের কোনো হিসাব দাখিল করেননি। কথাটা অবশ্য সত্যই ছিল। আগেও জানিয়েছি, মওলানা ভাসানী সে সময় বলেছিলেন, তাঁর নির্বাচনের প্রয়োজনীয় সকল অর্থই এসেছে মুরিদ এবং ভক্তদের সাহায্য থেকে। সে কারণে তাঁর নিজের কোনো অর্থ খরচ হয়নি এবং সেজন্যই হিসাব দাখিল করারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু তাঁর সে যুক্তিটিকে গ্রহণ করা হয়নি এবং হিসাব দাখিল না করার অভিযোগে প্রাদেশিক পরিষদে তাঁর সদস্যপদ বাতিল করা হয়েছিল।

ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনায় দেখা যাবে, ক্ষমতাসীনদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রধান লক্ষ্য ছিল আসলে মুসলিম লীগ বিরোধীদের রাজনীতির অঙ্গন থেকে বহিষ্কার করা। এর প্রমাণ মেলে টাঙ্গাইলের একই আসনের দ্বিতীয় উপনির্বাচনের ঘটনা থেকে। ১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন যুবনেতা শামসুল হক। এবারও ক্ষমতাসীনরা দাঁড় করিয়েছিলেন প্রথম নির্বাচনে পরাজিত জমিদার খুররম খান পন্নীকে। অথচ, নির্বাচনী মামলার রায়ে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, মওলানা ভাসানী এবং পন্নীসহ প্রথম নির্বাচনের কোনো প্রার্থীই ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা অযোগ্যতার এই নির্দেশটিকে বাতিল করিয়েছিলেন এবং সে কারণেই জমিদার পন্নী আবার প্রার্থী হতে পেরেছিলেন।

মওলানা ভাসানী এবার শামসুল হকের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তাঁর এই সমর্থন এবং জনগণ থেকে মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতার পরিণতিতে দ্বিতীয় উপনির্বাচনেরও জমিদার পন্নীকে অবমাননাকর পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল, কিন্তু এবারও ক্ষমতাসীনরা নির্বাচন বাতিলের অন্যায় পথে পা বাড়িয়েছিলেন। নির্বাচনী মামলায় মওলানা ভাসানী স্বাক্ষরিত একটি প্রচারপত্রকে কারণ হিসেবে উত্তাপন করে দাবি করা হয় যে, মুদ্রিত স্বাক্ষরটি জাল। কেননা, ওই সময়কালে মওলানা ভাসানী আসামের কারাগারে আটক ছিলেন।

আসলেও মুরিদ এবং রাজনৈতিক ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আসাম সফরে গেলে সংগ্রেস সরকার মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করেছিল। উপনির্বাচনের প্রাক্কালে হজরত আলী নামের জনৈক মুরিদ তাঁর সঙ্গে ধুবড়ি কারাগারে দেখা করতে গেলে তিনি শামসুল হককে নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়ে রচিত একটি প্রচারপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। সেই স্বাক্ষর স্বাবলিত প্রচারপত্রটিই মুদ্রিত আকারে প্রচার করা হয়েছিল। স্বাক্ষরের সঙ্গে প্রচারপত্রের কোথাও আসাম সরকার বা ধুবড়ি কারা কর্তৃপক্ষের কোনো সীলমোহর না থাকায় মুসলিম লীগ একে জাল স্বাক্ষর হিসেবে দাবি করে এবং অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে শামসুল হকের নির্বাচনকে বাতিল করার আবেদন জানায়। নির্বাচনী ট্রাইবুন্যাল আনীত অভিযোগকে যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচন এবং শামসুল হকের সদস্যপদ এ দুটিই বাতিল ঘোষণা করেছিল (১৯৫০)।

টাঙ্গাইলের একই আসনের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের একই প্রার্থীর পরপর দু'বার পরাজিত হওয়ার এই ঘটনাটি সার্বিকভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল, মুসলিম লীগের ভীত-সন্ত্রস্ত ক্ষমতাসীনরা ১৯৫৪ সালের আগে পূর্ব বাংলায় কোনো নির্বাচনই আয়োজন করার সাহস পাননি। এর ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বাঙালী জনগোষ্ঠী। কেননা, পূর্ববাংলার ৩৫টি শূন্য আসনের জন্য নির্বাচন স্থগিত রাখা হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং

সীমান্ত প্রদেশের পরিষদগুলোতে ১৯৫০-৫১ সালের মধ্যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পাকিস্তান গণপরিষদেও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্য পরিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু বাঙালীরা সে সুযোগ পায়নি।

সেজন্যই ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের দাবি-মুখে নির্বাচিত ব্যক্তিরা। ১৯৪৭ সালের ১৯ আগস্ট গঠিত ৭৯ সদস্যের গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ৪৪ জন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই গরিষ্ঠতা নির্ধারিত হলেও আগেই বলেছি, এদের সবাই বাঙালী ছিলেন না। ভারতের যুক্ত প্রদেশ থেকে আগত প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং বেগম শায়েস্তা ইকরামউল্লাহসহ অনেকেই পূর্ব বাংলার জন্য সংরক্ষিত আসন থেকে গণপরিষদে গিয়েছিলেন। সেই সাথে ছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিন এবং নূরুল আমীনদের মতো কেন্দ্রের বিশ্বস্ত অনুচররাও, যারা কোনোদিনই বাঙালী বা পূর্ব বাংলার স্বার্থের অনুকূলে কোনো ভূমিকা রাখেননি, বরং নিজেরাই পরবর্তীকালে বাঙালী-বিরোধী নায়কে পরিণত হয়েছিলেন। এসব কারণেই মওলানা ভাসানীর ভূমিকা কেবল দুর্দান্ত সাহসী ছিল না, ছিল জরুরিও।

'মওলানা ভাসানীর সময় ও সংগ্রাম' শিরোনামে ধারাবাহিক নিবন্ধের অংশ। সাপ্তাহিক সন্দ্বীপ, আগস্ট-নভেম্বর, ১৯৮৬

আওয়ামী লীগ : দলের গঠন ও প্রতিষ্ঠাতা প্রসঙ্গ

আওয়ামী লীগ এবার দলের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করছে। দলটির এই উৎসব অত্যন্ত স্বাভাবিক এজন্য যে, বাংলাদেশের মতো রাজনৈতিক দলপ্রধান দেশে একটি দলের পক্ষে সুদীর্ঘ ৫০ বছর ধরে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং একাধিকবার ক্ষমতাসীন হওয়া অবশ্যই এক কৃতিত্বপূর্ণ বিষয়। আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল, যা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে সরকারি নির্যাতন, প্রতিপক্ষের শত্রুতা ও বিরোধিতা এবং অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বিভিন্ন সময়ের ভাঙনসহ নানামুখী প্রতিকূলতা কাটিয়ে আজও পর্যন্ত একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে নিজের ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রদেশে সরকার গঠন করেছে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রধান একটি বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনকারী দল হিসেবে নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন কৌশলে প্রতিবারই আওয়ামী লীগ জনগণের মাঝে ফিরে এসেছে, ভূমিকা রেখেছে নতুন পর্যায়ে। আন্দোলনের নামে হরতালনির্ভর ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে আরো একেবার ক্ষমতাসীন হওয়াটাও দল হিসেবে আওয়ামী লীগের এক সন্দেহাতীত সাফল্য। এই প্রেক্ষাপটেই প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর উদযাপন করার যোগ্যতা ও অধিকার রয়েছে আওয়ামী লীগের।

এখানে বলে নেয়া ভালো যে, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উৎসব নিয়ে আলোচনা করা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। অপ্রয়োজনীয় সে আলোচনায় যাওয়ার পরিবর্তে বরং এমন দু'একটি তথ্যের উল্লেখ করা দরকার, যেগুলো আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ইতিহাসের পাশাপাশি বাংলাদেশের সঠিক রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরকম প্রধান তথ্যটি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাতা সংক্রান্ত। দলটির বর্তমান নেতৃবৃন্দ এবং তাদের সমর্থকদের পক্ষ থেকে সুকৌশলে ও সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে সুচিন্তিতভাবে অসত্য প্রচারণা চালানো হলেও তথ্যনির্ভর ইতিহাসের পর্যালোচনা এ তথ্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন দলটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাংলাদেশের জাতীয় নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। জন্মগতভাবে সিরাজগঞ্জের সন্তান হলেও মওলানা ভাসানীকে ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশ থেকে বহিস্কৃত ও বিতাড়িত হতে হয়েছিল। একজন নেতা হিসেবে তাঁর উত্থান ঘটেছিল পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আসামে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যখন স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় মওলানা ভাসানী তখন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। পাকিস্ত

ান হওয়ার পর পর স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী এবং প্রথম ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগ চলে গিয়েছিল গণবিচ্ছিন্ন কুচক্রী নেতাদের দখলে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সরকার বা মুসলিম লীগের যে কোনো ধরনের সমালোচনা ও বিরোধিতাকে সে সময় রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, অন্যদিকে বন্ধ করা হয়েছে মুসলিম লীগে প্রবেশের সকল দরজা। মুসলিম লীগকে এমনভাবেই কুচক্রী নেতারা কুক্ষিগত করেছিলেন যে, সাধারণ মানুষ দূরে থাকুক, এমনকি মওলানা ভাসানীর মতো একজন প্রধান নেতাকেও দলের প্রাথমিক সদস্যপদ দেয়া হয়নি। সে অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মে একদলীয় স্বৈরশাসনের সূচনা ঘটেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক পাকিস্তানী শাসকরা পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়েছেন বাধাহীনভাবে। পরিণামে স্বায়ত্তশাসনের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) বঞ্চিত হয়েছে, প্রাদেশিক রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ চলে গেছে কেন্দ্রের দখলে। চাকরি ও ব্যবসায়ও সুযোগ পায়নি পূর্ব পাকিস্তানীরা। বাংলাভাষী জনগণের প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বানানোরও উদ্যোগ নিয়েছিল।

সে পরিস্থিতিতে সরকার এবং ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বিরাধী দল গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নেন মওলানা ভাসানী। প্রদেশ জুড়ে বিকাশমান অসন্তোষ এবং বিচ্ছিন্নভাবে চলমান বিভিন্ন আন্দোলনকে সমন্বিত করার মাধ্যমে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী এক 'রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন' আহ্বান করেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ ও ২৪ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই কর্মী সম্মেলনেই গঠিত হয়েছিল প্রদেশের প্রথম বিরোধী দল 'পূর্ব পাকিস্তান অওয়ামী মুসলিম লীগ।' দলের ৪০ সদস্যবিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটিতে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, আতাউর রহমান খানসহ তিনজনকে সহ-সভাপতি, টাঙ্গাইলের যুবনেতা শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক এবং ইয়ার মোহাম্মদ খানকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়েছিল। দলের নাম প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জানানো হয়েছিল, এটাও 'মুসলিম লীগ', তবে 'জনগণের মুসলিম লীগ' এবং সে কারণেই 'আওয়ামী' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে প্রগতিশীল ও সংগ্রামী যুবনেতা শামসুল হক মাত্র কিছুদিন আগে টাঙ্গাইলের একটি উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে আলোড়ন তুলেছিলেন। (একই আসনে একই প্রার্থীকে মওলানা ভাসানী ১৯৪৮ সালে রাজিত করেছিলেন। কিন্তু মওলানা ভাসানী এবং শামসুল হক উভয়ের বিজয়কেই অন্যায়ভাবে বাতিল করা হয়েছিল।) আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণায় গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকারসহ' পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও কৃষকদের মধ্যে কৃষি জমি বিতরণের দাবি জানানো হয়েছিল।

তথ্যনির্ভর ইতিহাসের আলোকে এখানে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা প্রসঙ্গের উল্লেখ করা দরকার। দলটির বর্তমান নেতৃবৃন্দ এবং সমর্থকরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মওলানা ভাসানীর নাম এড়িয়ে যান এবং সামনে আনেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। বাস্তবে ১৯৪৯ সালের মার্চে স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে চলে আসার পর অবিভক্ত ব্রিটিশ বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান ক্ষেত্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। বিভিন্ন মামলা পরিচালনা উপলক্ষে মাঝে-মধ্যে ঢাকায় এলেও এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ঘটনাক্রমে যোগাযোগ রাখলেও শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানে কোনো দল গঠনের উদ্যোগ নেননি। আওয়ামী মুসলিম লীগেও তিনি পথম সুযোগে যোগ দেননি, বরং দলটি গঠিত হওয়ার তথা জুন মাসেরও অনেক পরে ১৯৪৯ সালের নভেম্বরেও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সভাপতি খালিকুজ্জামানকে লেখা এক চিঠিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার ওপর দলের সদস্য সংগ্রহের দায়িত্বভার দেয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি একথাও উল্লেখ করেছিলেন যে, তার দাবি পূরণ না করা হলে দেশে গণভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রবণতা দেখা দেয়ার আশংকা রয়েছে।

মুসলিম লীগ সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দাবি নাকচ করে দেন, তার চিঠিটি এমনকি দলের ওয়ার্কিং কমিটির সভায়ও উপস্থাপন করা হয়নি। সরকারি পর্যায়ে একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল সোহরাওয়ার্দী বিরোধী প্রবল প্রচার অভিযান। মুসলিম লীগে সুযোগ না পাওয়াসহ ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে শহীদ সোহরাওয়ার্দী নতুন একটি দল গঠনের উদ্যোগ নিতে বাধ্য হন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন সমমনা নেতার সঙ্গে যৌথভাবে রাজধানী করাচীতে এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে 'অল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে স্বতন্ত্র একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সভাপতি ও প্রধান সংগঠক এবং পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা আবদুস সাত্তার নিয়াজিকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। দলের প্রথম গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল ১৯৫১ সালের ২৫ জানুয়ারি। নতুন দল গঠনের পর থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানে যাতায়াত বাড়িয়ে দেন সত্য, কিন্তু মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন অওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান কিংবা এর সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা থেকে আগের মতোই বিরত থাকেন। অন্যদিকে তার ব্যস্ততা বেড়ে যায় পশ্চিম পাকিস্তানের তথা কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে। সে পর্যায়ে তিনি অন্য দু'টি দলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ দু'টি দল ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতা মানকি শরীফের পীরের নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে গঠিত 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' এবং ১৯৫০ সালে মামদোতের নবাবের নেতৃত্বে গঠিত 'জিন্নাহ মুসলিম লীগ'। শহীদ সোওরাওয়ার্দীর উদ্যোগে তার নিজের নেতৃত্বাধীন 'অল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের' সঙ্গে দল দু'টি একীভূত হয় এবং তিন দলের

সমন্বয়ে গঠিত হয় নতুন দল 'অল পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ' (২৪ জানুয়ারি, ১৯৫১)। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দলের কেন্দ্রীয় আহবায়ক নির্বাচিত করা হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সঙ্গে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন অল পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগের আনুষ্ঠানিকভাবে সাংগঠনিক সম্পর্ক স্থাগিত হয়েছিল আরো পরে– ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে। এর আগে '৫২ সালের ডিসেম্বরে লাহোরে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী এক কনভেনশনের মাধ্যমে ঐক্য প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু মওলানা ভাসানী কারাগারে থাকায় ঐক্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারেনি। (ভূখা মিছিলসহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করা হয়। '৫১ সালে মুক্তিলাভের পর '৫২-র ভাষা আন্দোলনকালে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি মুক্তিলাভ করেন '৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল)। মওলানা ভাসানী মুক্তি পাওয়ার পরপর '৫৩ সালের ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শহীদ সোহরাওয়ার্দির দলের সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে বছরের ৯ জুলাই ঢাকার 'মুকুল' সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে সিদ্ধান্তটি অনুমোদন লাভ করে। ভাষা আন্দোলনকালে উর্দুর পক্ষে বিবৃতি (২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) এবং সাধারণভাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দোদুল্যমানতার কারণে শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগের ঘোষণা ও কর্মসূচি মেনে চলার আহবান জানিয়ে কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যা-ই হোক না কেন, আওয়ামী মুসলিম লীগের কর্মসূচির প্রশ্নে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করলে আমরা সম্পর্কের বিষয়টি নতুনভাবে বিবেচনা করতে বাধ্য হবো।' উল্লেখ্য, এই কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে দেশরক্ষা, মুদ্রা ও পররাষ্ট্রনীতিকে কেন্দ্রের বিষয় হিসেবে রেখে বাকি সকল বিষয়কে প্রদেশের কর্তৃত্বে দেয়ার এবং পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি জানানো হয়েছিল। এখানে বলা দরকার, দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিল ১৯৫৫ সালের ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে। মওলানা ভাসানীর সভপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশন থেকে দলটি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নামে কার্যক্রম শুরু করেছিল।

এভাবে তথ্যনির্ভর যে কোনো পর্যালোচনায় এ সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, অন্য কোনো নেতা নন, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম সভাপতি ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। ১৯৫৩ এবং ১৯৫৫ সালের পর ১৯৫৬ সালের ১৯-২০ মে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনেও মওলানা ভাসানীকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, আওয়ামী লীগের সফল আন্দোলনের পথ ধরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী দলের ঘোষণা ও কর্মসূচি থেকে বিচ্যুত হন এবং বিশেষ করে স্বায়ত্তশাসন ও

পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে চলে যান সম্পূর্ণ পরিপন্থী অবস্থানে। সে পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন। ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এবং 'কাগমারী সম্মেলন' হিসেবে সমধিক পরিচিত এই কাউন্সিল অধিবেশনে একদিকে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তানকে 'শতকরা ৯৮ ভাগ' স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, স্বায়ত্তশাসন না দেয়া হলে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানাবে– অর্থাৎ, স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।

কাগমারী সম্মেলনের পর মূলত স্বায়ত্তশাসন ও পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে সংঘাত চলতে থাকে এবং প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে ১৯৫৭ সালের ১৩ জুন ঢাকায় আয়োজিত হয় কাউন্সিল অধিবেশনের নামে বিশেষ এক কর্মী সমাবেশ। প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানসহ কেন্দ্র ও প্রদেশের ক্ষমতাসীন নেতাদের সঙ্গে একযোগে এ সমাবেশের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। সমাবেশে ভাসানী সমর্থকদের লাঞ্ছিত করা হয়, মওলানা ভাসানীকেও অসম্মানিত করা হয়। ফলে তাঁকে সভপতি পদে বহাল রাখা হলেও এবং সে প্রস্তাবের প্রতি সম্মতি জানানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ জানানো হলেও মওলানা ভাসানী অসম্মত হন। তিনি ১৯৫৭ সালের ২৪ জুলাই নিজের প্রতিষ্ঠিত দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন এবং ২৫ জুলাই গঠন করেন নতুন দল পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। ন্যাপের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় শাখার সভাপতি পদে মওলানা ভাসানীকে নির্বাচিত করা হয়।

ওপরে সংক্ষেপে বর্ণিত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন বর্তমান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯৫৭ সালের ২৪ জুলাই পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী। পরবর্তীকালে দলত্যাগ করতে বাধ্য করা হলেও প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানীকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। আর যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর উদযাপন করার অর্থ দাঁড়ায় ইতিহাসের সঙ্গে প্রতারণা করা, জনগণকে বিভ্রান্ত করা এবং অসত্যের ওপর দাঁড়ানোর হাস্যকর প্রচেষ্টা চালানো।

উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ, দৈনিক ইনকিলাব, ২২.৬.১৯৯৯

ভাষা আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা

বাংলাদেশের জাতীয় নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মানুষের মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। ১৯৫৭ সালের জুলাই পর্যন্ত দলটির সভাপতি হিসেবে তিনি পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও প্রদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) সরকার গঠন করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসনের যে পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল, মওলানা ভাসানী ছিলেন তার প্রধান নির্মাতা। স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাকও তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন (৩০ নভেম্বর, ১৯৭০)। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর আজকের বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব বাংলার ওপর শোষণ, বঞ্চনা ও অবিচারের সূচনা হলে প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে তিনি স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে ক্রমাগত তীব্রতর করেছিলেন। স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হিসেবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে জনমত সংগঠিত করার মাধ্যমে মওলানা ভাসানী সমগ্র পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিলেন। স্বাধীনতামুখী সে অবস্থান থেকে জনগণকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।

১৯৪৮ সাল থেকে বিকশিত ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়েও মওলানা ভাসানীর ছিল বলিষ্ঠ ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্কের প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল জনসভার ভাষণে বা বিবৃতিতে নয়, পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পার্লামেন্ট বা ব্যবস্থাপক সভায়ও তিনি বাংলা ব্যবহারের দাবিতে সোচ্চার থেকেছেন। যেমন প্রাদেশিক ১৯৪৮ সালের ১৭ মার্চ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মওলানা ভাসানী ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা ভাষা ব্যবহার করার দাবি জানিয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে পার্লামেন্টের ভেতরে তিনি অবশ্য আর কথা বলার বা দাবি জানানোর সুযোগ পাননি। কারণ, স্বল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম লীগ সরকার ব্যবস্থাপক সভায় তাঁর সদস্যপদ বাতিল করিয়েছিল।

ওদিকে পাকিস্তানের জাতির পিতা ও গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' বলে ঘোষণা দেয়ার পর থেকে পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের শুরু হয়েছিল। জিন্নাহকে অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানও ঢাকা সফরে এসে কথিত 'প্রাদেশিকতার' কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে অত্যন্ত 'অশোভন'

আখ্যা দিয়ে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।' (১৮ নভেম্বর, ১৯৪৮) তখনও পর্যন্ত আসাম মুসলিম লীগের সাবেক সভাপতি হিসেবে পরিচিত মওলানা ভাসানী প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত মন্তব্য ও পূর্ব বাংলাবিরোধী বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। এভাবে বিরোধিতার মধ্য দিয়েই তাঁর সরকারবিরোধী ভূমিকার শুরু হয়েছিল। ফলে তাঁর ওপর নেমে এসেছিল নির্যাতন। তিনি দক্ষিণ টাঙ্গাইল থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সরকার তাঁর এই নির্বাচনকে বাতিল করে দেয়। সেই সাথে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নেয়ার ওপর আরোপিত হয় নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু সরকারের সঙ্গে আপস করার পরিবর্তে মওলানা ভাসানী আন্দোলনের পথে এগোতে থাকেন, প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম প্রভাবশালী বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ। ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আবারও বাংলা ভাষা ও কথিত 'প্রাদেশিকতার' সমালোচনা করলে প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরকালেই আর্মানিটোলা ময়দানে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভা থেকে রাষ্ট্রভাষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পূর্ব বাংলার দাবি তুলে ধরা হয়। আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করা হয়।

লিয়াকত আলী খানের পর প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্তি পেয়ে ঢাকা সফরকালে খাজা নাজিমউদ্দিনও উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির বিরোধিতা করার পাশাপাশি তিনি মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধেও কঠোর বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন মওলানা ভাসানীকে 'ভারতের চর' হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য পাকিস্তানের সংহতি নষ্ট করা। জবাবে এক দীর্ঘ বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, জনগণ মুসলিম লীগের শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে বলে এবং নিজেদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে পড়তে শুরু করেছে বলেই খাজা নাজিমউদ্দিন বেসামাল হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে 'আবোলতাবোল' অভিযোগ আনছেন। খাজা নাজিমউদ্দিনের রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকা বার লাইব্রেরি মিলনায়তনে সর্বস্তরের বিশিষ্ট নাগরিকদের এক সভায় গঠিত হয়েছিল 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ'। ৪০ সদস্যবিশিষ্ট সে কর্মপরিষদের এক নম্বর সদস্য ছিলেন মওলানা ভাসানী। আবুল হাশিম ও আতাউর রহমান খানের মতো প্রবীণ নেতাদের পাশাপাশি অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা ও আবদুল মতিনের মতো ছাত্র ও যুবনেতারাও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি ঢাকা নগরীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ ফেব্রুয়ারি যে ধর্মঘটের এবং সভা ও শোভাযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে সে সবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছিল। একাধিক বিবৃতি ও ভাষণে

মওলানা ভাসানীও কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রাজধানীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সেদিন পাঁচ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে সমবেত হয় এবং দীর্ঘ মিছিল নিয়ে বিক্ষোভ করে। বিকেলে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় দেয়া ভাষণে মওলানা ভাসানী পূর্ব বাংলার সঙ্গে মুসলিম লীগ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার কঠোর সমালোচনা করেন এবং রাষ্ট্রভাষার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

১৯৫২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ১৫০ নম্বর মোঘলটুলিতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে সেটা ভঙ্গ করা হবে কি হবে না প্রশ্নে দীর্ঘ বিতর্ক চলে। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে অলি আহাদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। তাকে সমর্থন জানিয়ে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, যে সরকার গণআন্দোলনকে বানচাল করার জন্য অন্যায়ভাবে আইন প্রয়োগ করে সে সরকারের জারি করা নিষেধাজ্ঞাকে মাথা নত করে মেনে নেয়ার অর্থ স্বৈরাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করা। মওলানা ভাসানীর এই দৃঢ় অবস্থানের ফলে আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। ২১ ফেব্রুয়ারি সর্বাত্মক ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষিত হয়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে এক মাসের জন্য সব মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে।

তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ সে পরিস্থিতিতে ঢাকার ৯৪ নবাবপুরে অবস্থিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের জরুরি সভা। এতে দীর্ঘ বিতর্কের পর ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে বেশি ভোট পড়লেও পরদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেই বিক্ষোভ মিছিল বের হয়েছিল। সে মিছিলের ওপরই গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। আগের কর্মসূচি অনুযায়ী মওলানা ভাসানী এ সময় ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রদেশের বিভিন্নস্থানে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সাংগঠনিক সফরে ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণ ও ছাত্রহত্যার খবর জেনেই তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত গায়েবানা জানাজায় অংশ নেন। মোহাম্মদ সুলতানের মতে তিনিই জানাজার নামাজে ইমামতি করেছিলেন। অন্যদিকে গাজীউল হক বলেছেন, তিনি মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের প্রধান সমর্থক সাপ্তাহিক 'সৈনিক' লিখেছে, 'মেডিকেল কলেজের সম্মুখে তিনি (অর্থাৎ মওলানা ভাসানী) লক্ষ লোকের একটি গায়েবানা জানাজায় নেতৃত্ব করেন।' (বশীর আল হেলাল, 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস', পৃ- ৩৭৪-৩৭৭)

২২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'ঢাকায় যাহা ঘটিয়াছে তাহার নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নাই। কোন সভ্য সরকার এরূপ বর্বরোচিত কান্ড করিতে পারে দুনিয়ার ইতিহাসে তার নজির খুঁজিয়া পাই না।... আমি মোমেনশাহী, পাবনা, কুমিলা সফর করিয়া গতরাত্রে ঢাকায় ফিরিয়া যাহা

দেখিলাম তাতে আমার কলিজা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নূরুল আমীন সরকার অবশেষে জাতির ভবিষ্যৎ ছাত্রসমাজকে দমাইবার জন্য চরম পন্থা অবলম্বনে মাতিয়াছে। ... আমি দাবী করি, অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করা হউক, পুলিশী গুলীর তদন্ত করার জন্য হাইকোর্ট জজ ও জনপ্রতিনিধি নিয়া গঠিত কমিশন নিযুক্ত করা হউক। আমি অপরাধীদের প্রকাশ্য বিচার দাবী করিতেছি। এই ব্যাপারে যাদের গ্রেফতার করা হইয়াছে তাদের মুক্তি দেওয়া এবং যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছে অবিলম্বে তাহা প্রত্যাহার করা হউক। সর্বোপরি শহীদদের পরিবারপরিজনকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হউক।...' (সাপ্তাহিক ইত্তেফাক, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)

ভাষা আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সরকার অসংখ্য ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেফতার করেছিল। মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করতে না পেরে তাঁর বিরুদ্ধে জারি করেছিল গ্রেফতারি পরোয়ানা। মওলানা ভাসানী আদালতে হাজির হয়ে গ্রেফতার বরণ করেছিলেন ১০ এপ্রিল (১৯৫২)। কারাগারেও তাঁর সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। রাষ্ট্রভাষা ও স্বায়ত্তশাসনসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দাবি পূরণ এবং আন্দোলনকালে গ্রেফতার করা রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি আদায়ের জন্য মওলানা ভাসানী এ সময় নতুন ধরনের অনশন শুরু করেন। সারাদিন তিনি রোজা রাখতেন অর্থাৎ পানাহার করতেন না। অনশন ভাঙতেন সন্ধ্যার পর। তাঁর অনুপ্রেরণায় অন্য বন্দিদের অনেকেও একইভাবে অনশন শুরু করেন। রাজবন্দি অলি আহাদ ও ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন, মওলানা ভাসানীর পরামর্শে তারা ৩৫ দিন রোজা রেখেছিলেন এবং এর ফলে কারাগারের ভেতরে-বাইরে বন্দিদের মুক্তির জন্য আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। পর্যায়ক্রমে অনেকে মুক্তিও পেয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল ১৯৫৩ সালের ২১ এপ্রিল। রোজা রাখার ধারাবাহিকতায় ১৮ এপ্রিল থেকে তিনি আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। এতে তাঁর শরীর খারাপ হতে থাকে, সে খবর প্রকাশিত হলে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। জনমতের চাপে সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কারাগারে মওলানা ভাসানী একদিনের অনশন করেছিলেন।

এভাবেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন মওলানা ভাসানী। সেকালের আরো অনেক নেতাও প্রাথমিক পর্যায়ে অংশ নিয়েছিলেন সত্য কিন্তু তাদের সবাইকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যেমন ভাষা আন্দোলনের অন্যতম ছাত্রনেতা গাজীউল হক জানিয়েছেন, 'মওলানা ভাসানীসহ যে ৪২ জন নেতা এই আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রভাবশালী কয়েকজন মন্ত্রিত্ব ও রাষ্ট্রদূতের পদ নিয়ে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। (ধানসিঁড়ি সংকলন, চতুর্থ প্রকাশনা, ১৯৮০, পৃ- ৫৮) এখানে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা ও পরবর্তীকালের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা সম্পর্কেও জানানো দরকার। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণ

ও ছাত্রহত্যার পর সমগ্র প্রদেশে যখন সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার উঠেছিল এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন যখন আরো দুর্বার হচ্ছিল তেমন এক পরিস্থিতির মধ্যেও ২৪ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দরাবাদ থেকে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, '... ঘটনা বর্তমানে ঘটিলেও বহু পূর্বেই পূর্ব বংগে ভাষা সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিয়াছে। আমি সেই সময় একটি জনসভায়ও এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলাম, যে-আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তদনুসারে উর্দুই হইবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।... বাংলার বুকে অবশ্য উর্দুকে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, তবে বিদ্যালয়ে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষারূপে ইহা পড়ান হইবে এবং যথাসময়ে এই প্রদেশবাসীগণ এই ভাষার সহিত পরিচিত হইয়া উঠিলে প্রদেশের শিক্ষিত সমাজ ও সরকারী কর্মচারীগণ আপনা হইতেই ইহা পড়িতে ও লিখিতে শুরু করিবে। তখন উর্দু তাহাদের নিকট গৌরবজনক মর্যাদাই লাভ করিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানীরাও দুই ভাষাভাষী হইবে।...' (দৈনিক আজাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)

উল্লেখ্য, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর এই বক্তব্যের কঠোর বিরোধিতা করে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। দলের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'সংবাদপত্রে জনাব সোহরাওয়ার্দীর এক বিবৃতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। উহাতে তিনি পরোক্ষভাবে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের জন্য ওকালতী করিয়াছেন।... উহাতে তাহার ব্যক্তিগত অভিমতই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতেছি যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহিত না হওয়া পর্যন্ত এবং সরকার কর্তৃক কার্যকরী না করা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাইবে। আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার দাবী করা হইয়াছে এবং এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার পর হইতেই আমরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছি।' (দৈনিক আজাদ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)

দলের পাশাপাশি মওলানা ভাসানী নিজেও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষেই ভূমিকা পালন করেছিলেন। মূলত আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে তাঁর অব্যাহত দাবি ও চাপের কারণেই ১৯৫৬ সালে রচিত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল।

দৈনিক আমার দেশ, শহীদ দিবস সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা

নিজেদের রাজনৈতিক সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস জানা না থাকলে কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর পক্ষেই মুক্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। ইতিহাস জানা না থাকার কারণে অনেক ত্যাগ আর জীবনের বিনিময়ে গড়ে ওঠা নতুন নতুন আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়। অন্যদিকে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ষড়যন্ত্রসহ বিভিন্ন পথে অঙ্গত সুবিধা নেন একশ্রেণীর অসৎ রাজনীতিক। পাকিস্তানের ২৪ বছরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বিভ্রান্তি ও অসততার কারণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রতারণার শিকার হতে হয়েছিল। কোনো কোনো নেতার উদ্যোগে সুপরিকল্পিতভাবে প্রদেশের অধিবাসীদের বঞ্চনার শিকার বানানো হয়েছে। সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও নস্যাৎ হয়ে গেছে একাধিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দেয়ার জন্য ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানকে পর্যালোচনায় নেয়া যেতে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পেছনে এই গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রত্যাহার, শেখ মুজিবুর রহমানসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং পাকিস্তানের 'লৌহ মানব' হিসেবে পরিচিত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিদায় ছিল সে গণঅভ্যুত্থানের প্রধান অর্জন। বলা দরকার, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নিজেই তার পরিণতির তথা '৬৯-এর ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানের কারণ বা প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক শাসনের অবৈধ পথে ক্ষমতা দখলের পর থেকে গৃহীত বিভিন্ন নীতি ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে তিনি পাকিস্তানে তার স্বৈরশাসনকে সর্বব্যাপী করেছিলেন। অব্যাহত রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং জনগণকে অধিকারবঞ্চিত রাখার পাশাপাশি ১৯৬২ সালে তিনি এমন এক শাসনতন্ত্র বা সংবিধান চাপিয়ে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে এমনকি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারও স্বীকৃত হয়নি। আইয়ুবের সংবিধানে শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সংখ্যাসাম্যের বিধান চাপানো হয়েছিল। সে বিধান অনুযায়ী সাধারণ ভোটারদের ভোটে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রী' বা বেসিক ডেমোক্র্যাট নির্বাচিত হতেন। এদের বলা হতো 'বিডি মেম্বার'। বিডি মেম্বাররাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে এবং প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের সদস্য তথা এমপিএ ও এমএনএদের নির্বাচিত করতেন। টাকা ও সুযোগ-সুবিধার বিনিময়ে বিডি মেম্বারদের ভোট সহজেই কেনা যেতো বলে কোনো নির্বাচনেই জনগণের ইচ্ছা ও আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটতে পারতো না। বিডি মেম্বাররা একই সঙ্গে সরকারের অনুচরবৃত্তিও করতেন। তাদের চিহ্নিত করা হতো আইয়ুব

খানের 'দালাল' হিসেবে। এভাবে অনুচর ও দালাল তৈরির পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শোষণ ও জাতিগত নিপীড়ন চালানোর ব্যাপারেও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তার পূর্বসুরীদের অনুসরণ করেছিলেন। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকেও তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত রেখেছিলেন।

এই বৈষম্য, দুর্দশা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এবং পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আইয়ুব শাসনের প্রথম দিনগুলো থেকেই বিভিন্ন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়েছিল প্রদেশের সংগ্রামী ছাত্র সমাজ। ১৯৬০ সালে সূচিত সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের ধারায় ১৯৬২-র সেপ্টেম্বরে শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলনে তারা প্রথম সাফল্য অর্জন করেছিল। উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের দিনগুলোতে অরক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানের অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে প্রধান বিষয়ে পরিণত করে শেখ মুজিব তার ৬ দফা উত্থাপন করেছিলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬)। নতুন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত হলেও ৬ দফা প্রণীত হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার (১৯৫৪) ১৯ তম দফার ভিত্তিতে। ফলে কর্মসূচি হিসেবে স্বায়ত্তশানের দাবি উত্থাপনের এই পদক্ষেপের মধ্যে নতুন বা বৈচিত্র্যের কোনো উপাদান ছিল না। কিন্তু এমন এক সময়ে ৬ দফা উপস্থাপিত হয়েছিল, যখন যুদ্ধে পরাজয় এবং তাসখন্ত চুক্তির মাধ্যমে ভারতের হাতে 'জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান' তুলে দেয়ার অভিযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকরা আইয়ুব-বিরোধী জোর প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৬ দফাকে আইয়ুব খান আত্মরক্ষার অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। পরিণামে শেখ মুজিবকে বারবার গ্রেফতারবরণ করতে হয়েছিল। গ্রেফতার, জামিন এবং আবারও গ্রেফতারের ধারায় শেষ পর্যন্ত তিনি প্রতিরক্ষা আইনের অধীনে দীর্ঘকালের জন্য বন্দী হয়ে পড়েছিলেন (৯ মে, ১৯৬৬)। আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্য অন্য নেতাদেরও আটক করা হয়েছিল। গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ঢাকায় পালিত হরতালের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ৬ দফা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন অর্জন এবং আন্দোলনে তাদের টেনে আনার প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা ছিল সেদিনের এই পরিণতির প্রধান কারণ।

৬ দফা আন্দোলনের এই ব্যর্থতা নানা দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছিল। ৬ দফার প্রশ্নে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। 'পিডিএমপন্থী' এবং '৬ দফাপন্থী' নাম নিয়ে দুটি আওয়ামী লীগ তৎপরতা চালাতে শুরু করেছিল। ন্যাপেও ভাঙন ঘটেছিল ৬ দফার প্রশ্নে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ ৬ দফা সমর্থন করেনি, বিকল্প কর্মসূচি হিসেবে হাজির করেছিল ১৪ দফা (৪-৭ জুন, ১৯৬৬)। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের খান আবদুল ওয়ালী খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে দলে ভাঙন ঘটিয়ে গঠন করা হয়েছিল 'মস্কোপন্থী' ন্যাপ (১৬-১৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৭)। এই ন্যাপের পূর্ব পাকিস্তানী নেতারা ৬ দফাকে 'জাতির মুক্তি সনদ' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর এই ভাঙন এবং দুর্বলতার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য, শোষণ ও নিপীড়নকে দৃঢ়তর করার পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপরও বেশি নির্যাতন চালাতে শুরু করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি তাকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র প্রধান আসামী হিসেবে জড়িত করা হয়েছিল। সে পরিস্থিতিতেও আওয়ামী লীগ কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। অনেকটা গোপনে অনুষ্ঠিত দলের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে অভিযুক্ত শেখ মুজিবকে 'আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানপূর্বক প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের' জন্য সরকারের প্রতি 'আবেদন' জানানো হয়েছিল (২১ জানুয়ারি, ১৯৬৮)। আওয়ামী লীগ তখন এমনকি ষড়যন্ত্র মামলাটিকে মিথ্যা বা সাজানো মামলা হিসেবে অভিহিত করার মতো অবস্থায়ও ছিল না। '৬৮ সাল জুড়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি চলেছে, শুনানির বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এমন কোনো তথ্য-প্রমাণ নেই, যার ভিত্তিতে বলা যাবে, '৬ দফাপন্থী' আওয়ামী লীগ মামলাটির বিরুদ্ধে কোনো মিছিল বা সমাবেশ করেছিল। ঢাকায় তো বটেই, প্রদেশের অন্য কোথায়ও দলটির তৎপরতা দেখা যায়নি। অনেকস্থানে আওয়ামী লীগের নেতারা এমনকি দলের অফিসে যাতায়াতও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এখানে কৌতূহলোদ্দীপক একটি তথ্যেরও উল্লেখ করা দরকার। তথ্যটি হলো, শেখ মুজিবের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং 'পিডিএমপন্থী' আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম খানই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবের পক্ষে প্রধান কৌসুলী বা আইনজীবী হিসেবে সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন।

৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের শুধু নয়, সব মিলিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থাও সে সময় শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। প্রতিবাদহীন রাজনৈতিক স্থবিরতার সেই দিনগুলোতে আইয়ুব বিরোধী সফল আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন মওলানা ভাসানী। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে বিভিন্ন ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান স্বায়ত্তশাসনের জন্য দাবির বিরোধিতা এবং প্রয়োজনে 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগের হুমকি উচ্চারণ করেছিলেন। ৫ ডিসেম্বর ঢাকার 'রমনা গ্রীন'-এর সমাবেশে আইয়ুব খান চ্যালেঞ্জের সুরে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, আন্দোলন বা বিক্ষোভের পথে তাকে যা তার সরকারকে টলানো যাবে না। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের এসব উসকানিমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদে 'জুলম প্রতিরোধ দিবস' পালন শেষে ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত বিশাল জনসভা থেকে মওলানা ভাসানী প্রত্যক্ষ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন (৬ ডিসেম্বর,

১৯৬৮)। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ উত্থাপিত বিভিন্ন দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে খাজনা-ট্যাক্স দেয়া বন্ধ করা হবে জানিয়ে মওলানা ভাসানী তাঁর বিখ্যাত 'ঘেরাও আন্দোলন'-এর কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন।

ঘেরাও আন্দোলনের সূচনাও ঘটেছিল সেদিনই। পল্টন ময়দান থেকে জনসভার মানুষকে মওলানা ভাসানী নিয়ে গিয়েছিলেন গভর্নর হাউস (বর্তমান বঙ্গভবন) ঘেরাও করতে। ঘেরাওকারী জনতার ওপর পুলিশ বেধড়ক লাঠিচার্জসহ প্রচণ্ড নির্যাতন চালায় এবং এর প্রতিবাদে পরদিন, ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী ঢাকায় হরতাল আহ্বান করেন। এই হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে দু'জন শহীদ এবং ১৬ জন আহত হওয়ায় ৮ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করেন। সে হরতালও সফলভাবে পালিত হয়। মওলানা ভাসানী ১৪৪ ধারা অমান্য করে বায়ুতুল মোকাররম প্রাঙ্গণে লক্ষাধিক মানুষকে নিয়ে শহীদদের গায়েবানা জানাজার নামাজে ইমামতি করেছিলেন।

মওলানা ভাসানীর ঘেরাও আন্দোলন অচিরেই পূর্ব পাকিস্তানের সব অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সূচিত সফল এই ঘেরাও আন্দোলন প্রদেশের বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত ছাত্র সমাজকেও ঐক্যবদ্ধ হতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া)–এর সমন্বয়ে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি গঠিত 'ছাত্র সংগ্রাম কমিটি'র পক্ষ থেকে ১৪ জানুয়ারি ঘোষিত হয়েছিল ঐতিহাসিক ১১ দফা। ছাত্র সমাজের কর্মসূচি হলেও ১১ দফার মধ্যে শ্রমিক-কৃষকসহ সকল শ্রেণীর মানুষের দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেই সাথে ছিল সংবিধান ও পররাষ্ট্রনীতিসহ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রস্তাব। প্রথম দফায় শিক্ষা সংক্রান্ত ১৭টি দাবি উল্লেখ করার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফা দুটিতে শাসনতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল।

সকল শ্রেণীর মানুষের কর্মসূচি হওয়ায় ১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সর্বাত্মক গণঅভ্যুত্থান ঘটতে থাকে এবং ভাসানীপন্থী ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান, স্কুল ছাত্র মতিউর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর ড. শামসুজ্জোহাসহ শতাধিক সংগ্রামীর মৃত্যু মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে আইয়ুব সরকারের ভিত্তিকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দেয়। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে সর্বত্র মানুষ ঘেরাও-মিছিল ও ভাঙচুরের মতো কর্মকান্ডের মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থানে অংশ নিতে এগিয়ে আসতে থাকে। ওই দিনগুলোতে গ্রামে গ্রামে মানুষ বিডি মেম্বারদের ঘেরাও করেছে। আইয়ুবের দালাল হিসেবে পরিচিত বিডি মেম্বার ও চেয়ারম্যানদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। অনেক এলাকায় তহশিল অফিসও পুড়িয়ে দিয়েছে তারা। মানুষ একই সঙ্গে খাজনা-ট্যাক্স দেয়াও বন্ধ করেছিল।

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ১১ দফার সমর্থনে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও আন্তরিক ভূমিকা পালন করেছিলেন মওলানা ভাসানী। বিরামহীন সফর, ভাষণ এবং ঘেরাও মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার ম্যাধমে তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পতনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিলেন। অভ্যুত্থান ব্যাপক হয়ে ওঠার সাথে সাথে ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগও অংশ নিয়েছিল। কিন্তু দলটির অংশগ্রহণ এবং ১১ দফার প্রতি সমর্থন সর্বাত্মক বা প্রশ্নাতীত হতে পারেনি। এর কারণ, ১১ দফা ঘোষিত হওয়ার পরপর '৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক অন্য সাতটি দলের সঙ্গে আট দলীয় জোট 'ড্যাক' বা ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি গঠন করেছিল। ড্যাক-এর আট দফা কর্মসূচিতে সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় দাবি স্বায়ত্তশাসন শব্দটি পর্যন্ত ছিল না, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের মতো দাবিও অনুপস্থিত ছিল। তাছাড়া দুই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাশাপাশি শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করা হয়েছিল (ঙ) তথা পঞ্চম পঞ্চম দফায়। উল্লেখ্য, ড্যাক-এর শরিক দলগুলো ছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামী ইসলাম পার্টি, পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগ, এনডিএফ এবং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের ধুরন্ধর রাজনীতিক এবং শেখ মুজিব বিরোধী পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগ নেতা নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানকে ড্যাক-এর আহ্বায়ক বানানো হয়েছিল।

গণঅভ্যুত্থানের প্রচণ্ডতায় বিপন্ন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আত্মরক্ষার কৌশল থেকে ড্যাক-এর শরণাপন্ন হয়েছিলেন, রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তিনি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ১ ফেব্রুয়ারি। ড্যাক-এর পক্ষ থেকে অনুকূল সাড়া এসেছিল তাৎক্ষণিকভাবে, বন্দী নেতা শেখ মুজিবও প্যারোলে বৈঠকে যোগ দিতে সম্মতি জানিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী তাকে রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতা। আইয়ুবের প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মওলানা ভাসানীও। গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকে তিনি 'আত্মহত্যার শামিল' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী 'চরমপত্র' উচ্চারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'প্রয়োজন হলে ফরাসী বিপ্লবের মতো ক্যান্টনমেন্টে ভেঙে শেখ মুজিবকে মুক্ত করা হবে।' মওলানা ভাসানীর এই ঘোষণায় গণঅভ্যুত্থান আরো বেগবান ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা কারফিউ ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসে। হতাহত হয় অজানা সংখ্যক আন্দোলনকারী। ২০ ফেব্রুয়ারি সরকার কারফিউ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। গণঅভ্যুত্থানের প্রচন্ড চাপে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন, শেখ মুজিবসহ অভিযুক্তরা এবং সেই সঙ্গে অন্য রাজনৈতিক নেতারাও মুক্তি পান।

কিন্তু শেখ মুজিব মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই নিশ্চিত বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে যাওয়া গণঅভ্যুত্থান বিভ্রান্ত এবং স্তিমিত হতে শুরু করেছিল। আন্দোলনকারী ছাত্র-

জনতার উদ্দেশে 'নিশ্চিন্ত থাকার' উপদেশ দিয়ে মুক্তি লাভের চারদিনের মধ্যেই শেখ মুজিব আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯)। সেখানে তিনি ভাষণ দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন আরো পরে– ১০ মার্চ। এই ভাষণে ১১ দফার কথা উচ্চারণ করলেও শেখ মুজিব তার মূল বক্তব্য এবং বিভিন্ন প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলেন নিজের বিস্মৃতপ্রায় কর্মসূচি ৬ দফার ভিত্তিতে। গোলটেবিল চলাকালে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্তি দিয়ে গোপন সমঝোতারও প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু একদিকে মওলানা ভাসানীর তীব্র বিরোধিতা এবং অন্যদিকে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে চলমান প্রচণ্ড গণঅভ্যুত্থানের চাপে এই সমঝোতা চেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায়। সংসদীয় সরকার পদ্ধতি ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শেষরক্ষা করতে ব্যর্থ হন। সেনাপ্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের কাছে তাকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয়, পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো প্রবর্তিত হয় সামরিক শাসন (২৫ মার্চ, ১৯৬৯)।

আইয়ুব সরকারের পতন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ও সংসদীয় সরকার পদ্ধতির নীতিগত স্বীকৃতি আদায় ছিল ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ সাফল্য। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিপুল আত্মত্যাগ এবং অসম সাহসী সংগ্রাম সত্ত্বেও ১১ দফার তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মূল দাবিগুলোর কোনো একটিও অর্জিত হয়নি। আইয়ুব সরকারের দমন-পীড়ন ও হত্যা এবং পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিকে রাজনীতিকদের অন্তর্ঘাতী তৎপরতার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনবিমুখ নীতি ও কার্যক্রম ছিল মহান সে গণঅভ্যুত্থানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। এদেশের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শেষদিকে আন্দোলন আবর্তিত হয়েছিল প্রধানত শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিকে কেন্দ্র করে। ছাত্র-জনতার প্রত্যাশা ছিল, মুক্তি পাওয়ার পর শেখ মুজিব তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করবেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিব ছাত্র-জনতাকে নিরাশ ও বিভ্রান্ত করেছিলেন। কারণ, পর্যালোচনায় দেখা যাবে, সরকারের পতন সময়ের ব্যাপারে পরিণত হলেও গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিব অংশ নেয়ায় আইয়ুব খান তখনকার মতো বেঁচে গিয়েছিলেন।

পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করেছে, নিজেকে রক্ষার এবং গণঅভ্যুত্থানকে বিভ্রান্ত ও নস্যাৎ করার কৌশল হিসেবেই আইয়ুব খান গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করেছিলেন। একই কারণে মওলানা ভাসানী নিজেই শুধু বর্জন করেননি, শেখ মুজিবকেও বৈঠকে অংশ না নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবসহ রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য যেহেতু কোনো গোলটেবিল বৈঠকের প্রয়োজন পড়েনি, সেহেতু স্বায়ত্তশাসনসহ ১১ দফার বাকি দাবিগুলোও আন্দোলনের মাধ্যমেই আদায় করা

যাবে। এটা যুক্তিরও কথা ছিল। অন্যদিকে মওলানা ভাসানীর পরামর্শ উপেক্ষা করে শেখ মুজিব ২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ফাঁদে পা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল নিয়েছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় আইয়ুব খানের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কৌশলই সফল হয়েছিল। ছাত্র-জনতা শেখ মুজিবের দিকে আশায় তাকিয়ে থাকায় এবং মাঝখানে ঈদুল আযহার ছুটি পড়ে যাওয়ায় গণঅভ্যুত্থান স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আইয়ুব খান পদত্যাগ করে সরে গিয়েছিলেন, পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো প্রবর্তিত হয়েছিল সামরিক শাসন (২৫ মার্চ, ১৯৬৯)। সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

জনপ্রিয়তার প্রভাব ব্যবহার করে নিজের বিস্মৃতপ্রায় কর্মসূচি ৬ দফাকে পুনর্বাসিত করার পথেও শেখ মুজিব জনগণকে নিরাশ করেছিলেন। ১৯৬৬ সালের জুন আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে ষড়যন্ত্র মামলার শুনানির সময়কাল তথা ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জনগণের নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতার কারণে কেবল নয়, ৬ দফা বিরোধী আওয়ামী লীগ প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বাধীন ড্যাক-এ আওয়ামী লীগের যোগদানের অবমাননাকর ঘটনার মধ্য দিয়েও ৬ দফার বর্থতা ও এর প্রতি জনগণের সমর্থনহীনতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। তারপরও শেখ মুজিব তার ৬ দফাকেই তুলে এনেছিলেন। কারণ, ১১ দফার মধ্যে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতী জনতার মুক্তির লক্ষ্যাভিসারী সঠিক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শেখ মুজিবের পক্ষে ১১ দফার মতো প্রগতিশীল কর্মসূচি সমর্থন ও গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। আসলে জনগণের মুক্তি অর্জনের মৌলিক প্রশ্নেই শেখ মুজিবের দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনীতি ছিল প্রশ্নসাপেক্ষ। সেই সাথে ছিল নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষাও। না হলে ১১ দফাকে নিয়েই তিনি এগিয়ে যেতেন। কেননা, এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফা দুটি মূলত তার ৬ দফার আলোকে প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু উচিত হলেও তিনি তা করেননি। বরং কিছুদিন পর্যন্ত '১১ দফা ও ৬ দফা' বলার পর ধীরে ধীরে গোটা ১১ দফাকেই তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন, ধরে রেখেছিলেন নিজের ৬ দফাকে। নির্বাচনী কর্মসূচিও তিনি ৬ দফাকেই বানিয়েছিলেন। জনপ্রিয়তার প্রভাব খাটিয়ে এমন এক প্রচারণাকেও শক্তিশালী করেছেন যেন '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল ৬ দফার ভিত্তিতেই! যেন ১১ দফা কোনো বিষয় ছিল না! আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এখনো, এত বছর পরও অমন প্রচারণাই চালানো হয়।

অন্যদিকে তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস কিন্তু এ ধরনের দাবি ও প্রচারণাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয় না। যে কেউ ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানার জন্য সে সময়ের পত্রপত্রিকা পড়ে দেখতে পারেন। দেখবেন, আইয়ুবের পতন ঘটেছিল আসলে অসামরিক প্রশাসন ভেঙে পড়ায়। মওলানা ভাসানীর আহবানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠেছিল। বিডি মেম্বার ও চেয়ারম্যানদের মানুষ

ঘেরাও করেছে, অনেককে গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে পিটিয়েছে। তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। একযোগে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে তহশিল অফিসসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসে। অবস্থা বেগতিক দেখে বিডি মেম্বার ও চেয়ারম্যানরা দলে দলে পদত্যাগ করেছেন। শেষদিকে পুলিশও সরকারের সব আদেশ মানতে চায়নি। সবকিছুর পেছনে ছিল মওলানা ভাসানীর ভূমিকা। তাঁর সে ভূমিকার জন্য বিশ্বের প্রভাবশালী সাপ্তাহিক 'টাইম' ম্যাগাজিন মওলানা ভাসানীকে 'প্রোফেট অব ভায়োলেন্স' আখ্যা দিয়েছিল। গণঅভ্যুত্থানের সময় মওলানা ভাসানীকে নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশ করেছিল। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে লেখা আইয়ুব খানের চিঠির মধ্যেও এ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এতে আইয়ুব খান প্রধানত প্রশাসন ভেঙে পড়ার এবং অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার কারণই জানিয়েছিলেন। (চিঠিটির জন্য দেখুন : অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫', পৃ. ৪৩০-৩৮) আইয়ুব খানের এ চিঠির ভিত্তিতে একথা অন্তত বলার সুযোগ নেই যে, গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার কারণে তাকে সরে যেতে হয়েছিল। বাস্তবে তাকে উৎখাত করেছিল '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান।

আলোচনার সমাপ্তিকালে বলা যায়, মওলানা ভাসানী ছাড়া অন্য নেতাদের অসততা, ষড়যন্ত্র, দৃষ্টিভঙ্গি এবং গণবিরোধী অবস্থান ও ভূমিকার কারণে সম্পূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও জনগণের অংশগ্রহণের দৃষ্টিকোণ থেকে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সম্পূর্ণরূপেই বিজয় অর্জন করেছিল। সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত ও স্তিমিত হলেও মহান এ গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও প্রেরণা পরবর্তীকালেও জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং অনিবার্য করে তুলেছে ১৯৭১-এর স্বাধীনতাকে। বিশ্লেষণের এই দৃষ্টিকোণ থেকে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় হেসেবে চিহ্নিত করা যায়। সে গণঅভ্যুত্থানে প্রধান ভূমিকা ছিল মওলানা ভাসানীর।

দৈনিক আমার দেশ-এর নিয়মিত কলাম 'অনুসরণ', ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩ (আংশিক পরিবর্তিত)।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা

পশ্চিম পাকিস্তানের বিজাতীয় শাসন, শোষণ, নির্যাতন আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জনের যে আন্দোলন ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল, মওলানা ভাসানী ছিলেন তার প্রধান নির্মাতা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপর পূর্ব বাংলার প্রতি অবিচারের সূত্রপাত হলে প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে এবং পরবর্তীকালে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন গঠিত আওয়ামী (মুসলিম) লীগের মাধ্যমে তিনি স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে ক্রমাগত তীব্রতা দিয়েছিলেন। তাঁর সে আন্দোলন কতিপয় বৈশিষ্ট্যের কারণে ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা ছাড়া বাকি সকল বিষয়ে পূর্ণ কর্তৃত্বসহ স্বায়ত্তশাসন চাইতেন তিনি ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে– যেখানে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অধিকারের স্বীকৃতি ঘোষিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, স্বায়ত্তশাসনের নামে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের স্থলে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠার মতো উগ্র-জাতীয়তাবাদী পথে কখনো যাননি। বরং সামন্তবাদ, বৃহৎ পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে সমন্বিত করে একযোগে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ, শোষণ এবং দুঃশাসনের কোনো একটি উৎসকেও অক্ষত রেখে অধিকার আদায় কিংবা ভোগ করতে চাওয়ার কোনো বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি থাকতে পারে না।

'আসসালামু আলাইকুম'

স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হিসেবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারণা চালানো ছিল মওলানা ভাসানীর আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বায়ত্তশাসনসহ প্রদেশের বিভিন্ন দাবি সংবলিত ২১ দফার ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী একজন প্রধান নেতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অবিভক্ত বাংলার দুই সাবেক প্রধানমন্ত্রী কৃষক-শ্রমিক পার্টির নেতা 'শেরে বাংলা' ফজলুল হক এবং আওয়ামী লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু নিরংকুশ বিজয় অর্জন করা সত্ত্বেও মূলত নেতৃত্বের কোন্দলে স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের বদৌলতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এমনকি এ ঘোষণা পর্যন্ত দিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান নাকি ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন পেয়ে গেছে! এ সময় থেকেই মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার প্রচারণাকে প্রকাশ্য করেছিলেন। ১৯৫৫ সালের ১৭ জুন এবং

১৯৫৬ সালের ৭ ও ১৫ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত তিনটি পৃথক জনসমাবেশে তিনি শাসনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দাবি করে বলেছিলেন, না হলে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্নতা তথা স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে হবে। উল্লেখ্য, সেকালে সংবিধানকে 'শাসনতন্ত্র' বলা হতো।

স্বায়ত্তশাসনের বিধানবিহীন ১৯৫৬-র শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধেও আন্দোলনকে তিনি এগিয়ে নিয়েছিলেন। সে আন্দোলন প্রচণ্ডতা পেয়েছিল আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)। রচনাকালে স্বায়ত্তশাসনের বিধান না থাকায় যে শাসনতন্ত্রকে সোহরাওয়ার্দী প্রত্যাখ্যান করে পরিষদের অধিবেশন বর্জনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সে একই শাসনতন্ত্রকে তিনি 'শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন' দেয়ার উৎস হিসেবে প্রশংসা করতে শুরু করেন। ফলে মওলানা ভাসানী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। প্রধানত স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি মীমাংসার প্রয়োজনে তিনি ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে আয়োজন করেছিলেন ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন। সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিকার এবং পূর্ব বাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেয়ার দাবি জানিয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেছিলেন, না হলে ভবিষ্যতে, আজ থেকে দশ বছর পর, এমন সময় আসতে পারে যখন পূর্ব বাংলা পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানানোর প্রবণতা অনুভব করবে। 'আসসালামু আলাইকুম'-এর ঘোষণা সে সময় সাধারণ ছিল না বরং ছিল অত্যন্ত গুরুতর। কারণ, মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগই তখন কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতাসীন ছিল ; প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এদিকে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্য নেতারা। তাদের প্রত্যেকেই সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানানোয় মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীর বিভিন্ন জনসভায় এমনকি সশস্ত্র হামলাও চালানো হয়েছিল। পরিণতিতে মওলানা ভাসানীকে তাঁর নিজের হাতে গড়া আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামে নতুন একটি দল গঠন করেছিলেন (২৫জুলাই, ১৯৫৭)।

'আসসালামু আলাইকুম' জানালেও মওলানা ভাসানী সেদিন সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানাননি। এর কারণ, শোষণ নির্যাতনের প্রক্রিয়া শুরু হলেও তখনও পর্যন্ত তা এমন প্রকট আকার নেয়নি যখন মানুষ স্বাধীনতার বিকল্পের কথা ভাববে। পাশাপাশি তাদের মনে তখনও ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের সদ্যার্জিত সাফল্যের আনন্দ, ছিল ইংরেজদের চাইতেও প্রত্যক্ষ শোষক 'হিন্দু' জমিদার-মহারাজাদের শোষণ-নিপীড়নের তাজা স্মৃতি। এজন্যই পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরোধিতা

বা স্বাধীনতার চিন্তা তখনও জনমনে 'হিন্দু' ভারতে ফিরে যাওয়ার ভীতি-আতংকের কারণ হয়ে উঠতো। ওদিকে বাঙালী ধনিক-বুর্জোয়ারাও ছিল অত্যন্ত দুর্বল এবং সংখ্যায় স্বল্প, পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজির সবল প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়ানোর মতো অবস্থায় তখনও তারা পৌঁছাতে পারেনি। তাছাড়া চরিত্রের কারণেও তারা মওলানা ভাসানীর পেছনে সমবেত হয়নি। কারণ, তাঁর আন্দোলন ছিল শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী জনতার স্বার্থে। তিনি চাইতেন সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবমুক্ত নিয়ন্ত্রিত বুর্জোয়া বিকাশ, শিল্প-কারখানার আড়ালে ধনিক শ্রেণীর শোষণ নয়।

অর্থাৎ বাঙালী বুর্জোয়াসহ জনগণের কোনো একটি অংশই সে সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো চূড়ান্ত পরিণতির জন্য তৈরি ছিল না, মওলানা ভাসানীও তাই আহ্বানকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে। তথাপি 'আসসালামু আলাইকুম'-এর পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ ও নিজামে ইসলাম থেকে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীসহ আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত বাঙালী বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলরা ভাসানী বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন। তাদের এই তাৎক্ষণিক আঁতাত-আয়োজন বাঙালীদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল, কি জন্য ও কারা তাদের বিপক্ষ শক্তি এবং কাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া এমনকি স্বায়ত্তশাসনের অধিকারটুকুও অর্জন করা সম্ভব নয়। পূর্ব বাংলার অধিকারবঞ্চিত অধিবাসীদের জাগৃতির লক্ষ্যে এখানেই ছিল মওলানা ভাসানীর 'আসসালামু আলাইকুম'-এর সার্থকতা।

পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন : '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান

এরপর দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার কথা প্রকাশ্যে না বললেও মওলানা ভাসানী তাঁর স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছেন সর্বতোভাবে। ১৯৬৬ সালের জুনে তাঁর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষ থেকে উপস্থাপিত ১৪ দফা ছিল এই লক্ষ্যে এক প্রগতিশীল কর্মসূচি। চীন-রাশিয়ার মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যাপের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বিভক্তি তাঁর আন্দোলনকে স্তিমিত করলেও তিনি লক্ষ্যচ্যুত হননি। বরং ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে 'ঘেরাও' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সূচনা করেছিলেন জঙ্গী এবং বলিষ্ঠ সংগ্রামের। ছাত্র সমাজের ১১-দফা আন্দোলনের সঙ্গে সর্বাত্মক একাত্মতাও ছিল মওলানা ভাসানীর এক বিরাট অবদান। অগ্নিঝরা সেই দিনগুলোতে প্রধানত তাঁর আপোসহীন ও বিরোচিত ভূমিকাই সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। বাঙালী ধনিক-বুর্জোয়াদের বিপুল অর্থ ব্যয়, সাম্রাজ্যবাদের আড়াল আনুকূল্য এবং আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষমতার লোভ পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতার মুখে অসহায় করে ফেললেও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী পরিস্থিতিকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন, যখন

সমগ্র পূর্ব বাংলা রুখে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-শোষক এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মুখোমুখি সে অবস্থান থেকে জনগণকে ফিরিয়ে আনা আর কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানকেন্দিক মোহ ভাঙনের যে প্রক্রিয়া তিনি ১৯৫০-এর দশকে শুরু করেছিলেন ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান তাকে পরিপক্ব করেছিল। এ ছিল সরাসরি পাকিস্তান-বিরোধী উত্থান।

১৯৭০-এর জলোচ্ছ্বাস ও স্বাধীনতার প্রথম আহ্বান

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল জলোচ্ছাসে পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে দশ লক্ষাধিক মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। লাখ লাখ মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। বেঁচে যাওয়া নরনারীর পুনর্বাসন, নিহতদের দাফন-সৎকার এবং দুর্গত এলাকায় ত্রাণ তৎপরতার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের আমর্জনীয় অবহেলা আর উদাসীনতা সাধারণ মানুষের মনে প্রচন্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। দায়সারা সংক্ষিপ্ত সফর ছাড়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কিছু করেননি, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কোনো মন্ত্রীও দুর্গত এলাকায় আসেননি। সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলো এমনকি ধ্বংসযজ্ঞের প্রকৃত তথ্যও ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো ত্রাণ সামগ্রী ফেলে রাখা হয়েছে দিনের পর দিন, বিতরণের ক্ষেত্রেও ছিল কারচুপি এবং অনিয়ম। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত পাকিস্তানের শাসকদের সে অবহেলা ছিল ক্ষমার অযোগ্য। এই আচরণের মধ্য দিয়ে শেষবারের মতো বাঙালীদের প্রতি তাদের প্রকৃত মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছিল। তারা বুঝিয়ে ছেড়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানীরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে কত অবজ্ঞার চোখে দেখতো।

পূর্ব পাকিস্তানের তথা পূর্ব বাংলার জনগণের সেই কঠিন দুঃসময়ে আশা, আশ্বাস আর ভরসার বাণীমুখে এগিয়ে এসেছিলেন মওলানা ভাসানী। চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালের বিছানা থেকে ছুটে গিয়েছিলেন উপদ্রুত এলাকা সফরে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, সরকারের অবহেলা আর পরিস্থিতির ভয়াবহতা তাঁকে গভীর বেদনা আর বিক্ষোভে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের আমনবিক অবহেলা এবং অবজ্ঞার প্রতিবাদে উপদ্রুত উপকূলীয় এলাকা থেকে ঢাকায় ফিরেই তিনি করেছিলেন সরাসরি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। ৩০ নভেম্বর এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ার' আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, "আজ আমি পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি বাঙালীকে তাহাদের জীবন-মরণ প্রশ্নের বিষয়টি পুনর্বার এবং শেষবারের মত দলমত নির্বিশেষে ভাবিয়া দেখিতে আকুল আবেদন জানাইতেছি।... ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট হইতে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানীদের আজাদীর লড়াই নতুনতম এবং শেষ পর্যায়ের রূপ লাভ করিবার অপেক্ষায় আছে মাত্র।... দুই যুগ ধরিয়া বৈষম্য আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু করিবার প্রচার

ও প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহারই সফল সংগ্রামী রূপায়নে আমাদের জীবনের বিনিময়ে হইলেও ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। আজ হইতে ১৩ বৎসর পূর্বেই ষড়যন্ত্র অত্যাচার শোষণ আর বিশ্বাসঘাতকতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে 'আসসালামু আলাইকুম' বলিয়াছিলাম... আজ আশা করি সচেতন ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন বাঙালীকে বুঝাইতে হইবে না যে, মানবতাবর্জিত সম্পর্কের মহড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠিয়াছে।...

"... আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না যে, আমাদের এহেন দুর্দিনে সরকার কি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে।... পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার নিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশন ১২ লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানিতে কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমাহীন ধৃষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছে তাহা আজ সাত কোটি বাঙালীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।... তাহাদের আহলাদ মাখা অনুষ্ঠানের কমতি হয় নাই; বার লক্ষাধিক রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয় নাই। লক্ষ লক্ষ লাশের দাফন-কাফনের কর্তব্যের কথা স্বীকার করা হয় নাই। এর চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কি হইতে পারে?

"আজ তাই আমাদের সম্মুখে কর্মসূচি পরিষ্কার হইয়া উছিয়াছে।... অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, অনেক কোরবানী দিয়াছি। আজ আমাদের হাতে যাহাই অবশিষ্ট আছে সবকিছুই উৎসর্গ করিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। এই সংগ্রাম ভাষণ-বিবৃতির নয়– প্রত্যক্ষ মোকাবেলার। এই মোকাবেলা আপোষ নিষ্পত্তিকল্পে চাপ সৃষ্টি করার সংগ্রাম নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি শোষিত নির্যাতিত বাঙালীর মুক্তিসংগ্রাম। দলমত নির্বিশেষে আজ সবাই আসুন, আমরা এক ও অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করি।...

"এইদিন আপনারা আওয়াজ তুলুন : পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে এবং আমাদের আজাদী রক্ষা করিতে আমরা সর্বস্ব কোরবানী দিতে সদা প্রস্তুত। সেই সাথে আপনারা বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুন : আমরা স্বাবলম্বী অত্মনির্ভরশীল এবং শৃঙ্খলমুক্ত হইতে চাই।..."

প্রচারপত্রের শেষাংশে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, মানবতার নামে আজাদীর লড়াইয়ে আমাদের সাফল্য অনিবার্য।... বাঙালী জাতির মুক্তি সংগ্রামকে রুখিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।'

উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের দুর্দশা আর অবমাননার সে দুঃসহ দিনগুলোতে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক আইনের 'আইনগত কাঠামো আদেশের' অধীনে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। স্বাধীনতা দূরে থাকুক, তিনি এমনকি ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল জলোচ্ছাসে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোরও উদ্যোগ নেননি। সরকারের ওপরও চাপ সৃষ্টি করেননি। শেখ মুজিব বরং জলোচ্ছ্বাসের কারণে নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ

করেছিলেন। ২৬ নভেম্বরের সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব বলেছিলেন, প্রয়োজনে আরো কয়েক লক্ষ জীবন দেয়া হবে তবু নির্বাচন পেছাতে দেয়া হবে না। (ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭০)

'ওরা কেউ আসেনি'

অন্যদিকে মওলানা ভাসানী আগেই নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার প্রতি অবহেলা দেখানোর প্রতিবাদে ১৯৭০ সালের ৪ ডিসেম্বর তিনি 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ওইদিন পল্টন ময়ানের বিশাল সমাবেশে তিনি প্রকাশ্যে প্রথমবারের মতো পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়ার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তারও আগে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ১২ লাখ মানুষের করুণ মৃত্যু এবং সরকারের অবহেলার বর্ণনা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সম্পর্কে বলেছিলেন, বাঙালীর এই ভীষণ দুর্দিনেও **'ওরা কেউ আসেনি'। এরপরই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন,** 'আমাদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হলে আরো পনেরো বিশ লাখ জীবন দিয়ে অভিষ্ট সিদ্ধি করবো, না হয় মৃত্যুবরণ করবো।' পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশে পবিত্র কুরআনের সুরা 'কাফেরুন' থেকে আয়াত উদ্ধৃত করে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন' (তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম)। অর্থাৎ তোমার রাস্তায় তুমি যাও, আমাকে আমার রাস্তায় চলতে দাও। এটা ছিল সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা। তিনি তাঁর স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামকে আইনসঙ্গত বলেও বর্ণনা করেছিলেন। শেখ মুজিবের প্রতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়ারগ আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে যারা কোটি কোটি টাকা নির্বাচনী ব্যয় করছে তাদের ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে চাই না। তারা নিজেরাই বলুন যে, তারা জনতার শত্রু না মিত্র।' [সাপ্তাহিক মাতৃভূমি, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭০] এই ঘোষণার ভিত্তিতেই মওলানা ভাসানীর ন্যাপ ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন বর্জন করেছিল। প্রমাণিত হয়েছে, ন্যাপ নির্বাচনে অংশ নেয়নি বলেই আওয়ামী লীগের পক্ষে নিরংকুশ বিজয় অর্জন করা এবং শেখ মুজিবের পক্ষে প্রধান নেতায় পরিণত হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

স্বাধীনতার পাঁচ দফা কর্মসূচি

নির্বাচনের পর মওলানা ভাসানী স্বাধীনতা সংগ্রামের পন্থা ও কর্মসূচি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ৯ জানুয়ারি সন্তোষে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এ উপলক্ষে ৭ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে তিনি ১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাবের' ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক আন্দোলনের পাঁচ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। কর্মসূচি পাঁচটি ছিল :

১. স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলা গঠনের প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবিতে জোর গণআন্দোলন গড়ে তোলা;
২. স্বাধীনতার ভিত্তি জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি এবং স্বাধীনতার সত্যিকার ফলভোগের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই যে একমাত্র পথ– একথা গ্রামে গ্রামে প্রচার করা;
৩. পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিদেশী পণ্য, ব্যাংক ও বীমা বর্জন এবং পাশাপাশি পূর্ব বাংলার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ও শিল্পকে উৎসাহ দান;
৪. বিগত ২৩ বছরে পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-শোষকদের শোষণ ও বঞ্চনার সঠিক চিত্র ৬২ হাজার গ্রামের অধিবাসীদের সামনে তুলে ধরা; এবং
৫. বাঙালীর দরদী সেজে যারা জনপ্রিয় বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে পরে বিশ্বাসঘাতকতার পথে জনতার মুক্তি সংগ্রামকে অঙ্কুরেই নস্যাৎ করে তাদের ধ্বংস করার জন্য সংগ্রাম শুরু করা। ('ভাসানীর পাঁচ দফা', দৈনিক ইত্তেফাক, ৮ জানুয়ারি, ১৯৭১)

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বাধীনতা দাবি

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করলে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৩ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধ-দিবস হরতালের কর্মসূচি উপস্থিত করেন। অন্যদিকে মওলানা ভাসানী তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বানমুখে তৎপর হয়ে ওঠেন। ৪ মার্চ মার্চ এক বিবৃতিতে তিনি বর্তমান সংকট নিরসনের জন্য লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, 'সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদীদের পরামর্শে যদি ৭ কোটি বাঙালীর এই দাবিকে উপেক্ষা করা হয় তবে বাংলাদেশের ৬২ হাজার গ্রামে জাতি-ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙালী যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে দাবি প্রতিষ্ঠা করবে।'

বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী আরো বলেন, '১৯৪৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় বিভিন্ন সরকার শান্তি-শৃংখলার নামে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে। পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামের নামে জনগণকে ভাওতা দিয়েছে। সরকার পুনরায় যেভাবে গণহত্যা ও বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য নানা কৌশলের আশ্রয় নিতে শুরু করেছে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। পূর্ব বাংলার শতকরা ৮৫ জন মানুষ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও ঘূর্ণিঝড়ের কবলে নিপতিত হয়ে বাঙালী আজ মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত। এমতাবস্থায় পাকিস্তানের জন্ম যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে, সরকার যদি তার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার ৭ কোটি বাঙালীকে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ভোগ করতে বাধা দেয় তাহলে বাঙালীরা শুধু সভা-

সমিতির দ্বারাই এর প্রতিবাদ করে বসে থাকবে না।' মওলানা ভাসানী বলেন, তিনি তাঁর ৮৯ বছরের জীবনে এবারের মতো গণজাগরণ এবং সরকারের অগণতান্ত্রিক ঘোষণার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ দেখেননি। তিনি বলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক ও শোষকগোষ্ঠী এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে কোন প্রকার আপোস করতে আর বাংলার জনগণ ইচ্ছুক নয়। কারণ এই গণদুশমনরাই গত ২৩ বছরে সোনার বাংলাকে শোষণ করে শ্মশানে পরিণত করেছে।' সরকার ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে যে কোনো দল বা ব্যক্তির আপোস চেষ্টার বিরুদ্ধেও তিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। স্বতঃস্ফূর্ত এই নজিরবিহীন জাগরণ এবং ঐক্যের জন্য মওলানা ভাসানী জনগণকেও মোবারকবাদ তথা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। (দৈনিক পাকিস্তান, ৫ মার্চ ১৯৭১)

স্বাধীনতার জন্য আমরণ সংগ্রামের ডাক

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের বিশাল সমাবেশে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বললেও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করে 'জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর' করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি দাবি জানিয়েছিলেন। 'ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার' আহ্বানের পাশাপাশি তিনি 'অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের' কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। অন্যদিকে ৯ মার্চ মওলানা ভাসানী এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালের কপট স্বাধীনতাকে সত্যিকারের স্বাধীনতায় রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে পূর্ব বাংলাকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার সাধারণ কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানান। মওলানা ভাসানী বলেন, 'আসুন আজ আমরা বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করি যে, পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের প্রকৃত গণতান্ত্রিক পূর্ণ ক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমরণ সংগ্রাম করে যাব।'

তিনি বলেন, 'জয় বাংলা রব তুলে নিপীড়িত কোটি কোটি বাঙালীর ভোট তথা সমর্থন নিয়ে সেই শক্তির বিনিময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষক ও সামরিক শাসকদের সাথে হাত মিলিয়ে যেনতেন প্রকারেন একটা আপোষ এবং সমঝোতার সরকার গঠনপূর্বক বঞ্চিত বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দ্বিধাহীন ও দুর্বার আকাংক্ষাকে পুনর্বার বানচাল করার যে চক্রান্ত মুষ্টিমেয় বাঙালী শোষক ও তাদের হোতারা করে চলেছে সেই হীন ষড়যন্ত্রকে আমরা শতকরা ৯৫ জন শোষিত নিপীড়িত বাঙালী আঙ্কুরেই প্রতিহত ও বিনষ্ট করব।'

প্রচারপত্রের শেষ অংশে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'আসুন, আমরা শেষ ও চূড়ান্তবারের মত পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে একত্রিত হই এবং পশ্চিম পাকিস্তানী, সাম্রাজ্যবাদী ও মুষ্টিমেয় বাঙালী শোষকের শত বাধা-বিপত্তি ও আক্রমণকে প্রতিহত করে জয়যাত্রা শুরু করি।'

সেদিনই, ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ ঢাকায় পল্টন ময়দানের এক বিশাল

জনসমাবেশে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, '১৩ বছর আগে কাগমারী সম্মেলনে আমি আসসালামু আলাইকুম বলেছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানকে বলেছিলাম যে তোমরা তোমাদের শাসনতন্ত্র রচনা কর, আমরা অমাদের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করি। আমি ৭ কোটি বাঙালীকে আজ মোবারকবাদ জানাই এজন্য যে, তারা এই বৃদ্ধের কথা এতদিন পর অনুধাবন করতে পেরেছে। শেখ মুজিবুর রহমান আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।'

পূর্ব বাংলার অসহায় নিরস্ত্র মানুষের ওপর বেপরোয়া গুলি বর্ষণের নিন্দা করে মওলানা ভাসানী ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, মুসলিম লীগ ও আইয়ুব খানের পতনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেছিলেন, এরা নিজেরাই নিজেদের পতন ডেকে এনেছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদ্দেশে মওলানা ভাসানী আরো বলেছিলেন, "বৃটিশ জাতি বুদ্ধিমান ছিল। তাই তারা উপমহাদেশের জনগণের সাথে সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হওয়ার মতো পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই স্বাধীনতা দিয়ে চলে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও তাই বলি, অনেক হয়েছে, তিক্ততা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। 'লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন' নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাও।"

আপোস বা অহিংসার পথে নয়

মওলানা ভাসানী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, সাত কোটি বাঙালীর মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। এ প্রশ্নে কোনো প্রকার আপোসও আর সম্ভব নয়। আপোসের সময় চলে গেছে। শেখ মুজিব, মওলানা ভাসানী বা অন্য কোনো নেতা যদি আপোস করতে চায় জনতা তাকে আস্ত রাখবে না।

অহিংস আন্দোলন প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী বলেন, আমি কোনোদিন অহিংসায় বিশ্বাস করি না। রসূল (স.) অহিংসায় বিশ্বাস করতে বলেননি। জুলুমের প্রতিশোধ নিতে বলেছেন। জালিমের অত্যাচার যে সহ্য করে এবং যে অত্যচার করে তারা উভয়েই মহাপাপী। তিনি বলেন, অহিংসা অবাস্তব পন্থা।

মওলানা ভাসানী ২৫ মার্চের মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, অন্যথায় মুজিবের সঙ্গে একযোগে বাঙালীর স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করা হবে। শেখ মুজিবকে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় চাইতে বাংলার সংগ্রামী বীর হওয়ার আহ্বান জানান।

ভাসানীর ১৪ দফা, মুজিবের আপোস আলোচনা

পল্টন ময়দানের এই সমাবেশে স্বাধীনতার লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী ১৪-দফা কর্মসূচি উপাস্থাপিত করেছিলেন। এতে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ও সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা; সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ,

উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ, একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েমের মাধ্যমে এবং ভাষা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। পূর্ব বাংলার সর্বত্র সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন, সকল প্রকার খাজনা-ট্যাক্স প্রদান বন্ধ, পশ্চিম পাকিস্তানী ও বিদেশী পণ্য, ব্যাংক-বীমা বর্জন, পতিত কৃষি জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ, চোরাচালান ও কালোবাজারি বন্ধ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং বিদেশী সৈন্য যাতে পূর্ব বাংলার মাটিতে আসতে না পারে সেজন্য চট্টগ্রাম ও খুলনার সমুদ্র বন্দরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেয়ার আহবান ছিল ১৪ দফার অন্তর্ভুক্ত। [দৈনিক পাকিস্তান, ১০ মার্চ ১৯৭১]

মওলানা ভাসানীর স্বাধীনতার আহ্বান সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চালাতে থাকেন। অন্যদিকে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা এবং একের পর এক নির্দেশনা জারি করতে থাকেন। ১৪ মার্চ ঘোষিত এরকম নির্দেশের সংখ্যা ছিল ৩৫। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্রমাগত জটিলতা সৃষ্টি করছিলেন। ১৫ মার্চ করাচীতে তিনি একথা পর্যন্ত বলেছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক সরকার পাকিস্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। উদ্ভট এ যুক্তির ভিত্তিতেই তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে দুই অঞ্চলের ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি জানিয়েছিলেন।

অমন এক পরিস্থিতিতে ১৬ মার্চ ঢাকায় শুরু হয়েছিল মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক। বাঙালীর স্বাধীনতার প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে অনুষ্ঠিত সে আলোচনার তৃতীয় বৈঠকের পর ২০ মার্চ শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'আলোচনা চালু রয়েছে এবং আমরা অগ্রসর হচ্ছি।' আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি না এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমি যখন বলি কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে তার থেকেই আপনারা বুঝতে পারেন।' অন্যদিকে ২১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা শেষে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেছিলেন, 'সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।' শেখ মুজিবও একই সুরে কথা বলতে থাকেন। ২২ মার্চ ইয়াহিয়া খান এবং ভুট্টোর সঙ্গে সোয়া এক ঘণ্টা ধরে আলোচনার পর তিনি বলেছিলেন, 'যদি কোনো অগ্রগতি না হতো তাহলে আমি কেন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি?'

আপোসের পথ পরিহার করো

এভাবে সমঝোতার জন্য আলোচনার পাশাপাশি শেখ মুজিবের মুখে অগ্রগতির দাবি স্বাধীনতার আকঙ্ক্ষায় উন্মুখ বাঙালীদের প্রতি মুহূর্তে বিভ্রান্ত করছিল, আন্দোলনের গতিবেগকে করছিল স্তিমিত। মওলানা ভাসানীই তখন একমাত্র দেশপ্রেমিক সংগ্রামী নেতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফরের মধ্য দিয়ে সে সময় তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামকে তীব্রতা দিয়েছিলেন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিচ্ছিন্ন আক্রমণে বিধ্বস্ত চট্টগ্রাম সফরকালে ১৭ মার্চ

তিনি বলেছিলেন, ইয়াহিয়া এবং মুজিবের মধ্যে আপোসের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তারা আপোস করতে চাইলেও সাত কোটি বাঙালী তা মেনে নেবে না। শেখ মুজিবের প্রতি তিনি আপোসের পথ পরিহার করে সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনাকালে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, স্বাধীনতার সর্বজনীন দাবিতে জনগণ যখন একতাবদ্ধ তখন মতাদর্শগত প্রশ্ন তোলা অনুচিত। তিনি বলেন, প্রথমে প্রধান ইস্যু তথা স্বাধীনতা সম্পর্কে মীমাংসা করতে হবে। পরে যদি দেখা যায় যে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি তখন তিনি আবার সংগ্রাম শুরু করবেন।

মওলানা ভাসানী আরো বলেছিলেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন। এখন সব ক্ষমতা জনসাধারণ ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনধিদের হাতে। ইয়াহিয়া এখন যা করতে পারেন তা হলো একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন– যার কাজ হবে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সম্পদ ও দায়ের হিসাব করা এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে দুই অংশের মধ্যে সে সব বণ্টন করে দেয়া।'

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যাণ্ড ও ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চকে মওলানা ভাসানী 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন দিবস' ঘোষণা করেছিলেন। সেদিন সন্তোষে তিনি পাকিস্তানের পতাকার পরিবর্তে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে লাল পতাকা উত্তোলন করেন। সন্তোষে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশ তিনি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের সমালোচনা করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত যোসেফ ফারল্যান্ডের সঙ্গে শেখ মুজিবের রুদ্ধদ্বার বৈঠকের নিন্দা করে তিনি আলেচনার বিষয়বস্তু প্রকাশ করার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় আপোস বা ষড়যন্ত্রের পথে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে নস্যাত কিংবা বিপথগামী করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

ভারতে ভাসানী ঃ স্বাধীনতার জন্য স্বাধীনতা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় গণহত্যা শুরু করলে মওলানা ভাসানী সন্তোষে এক স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে গ্রামে-গঞ্জে গেরিলা বাহিনী গঠন করে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করার এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান। ৩ এপ্রিল পাকবাহিনী তাঁর সন্তোষের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। এ সময় তিনি ধলেশ্বরীর তীরে বিন্নাফৈর গ্রামে আশ্রয় নেন। ৫ এপ্রিল তিনি নৌকাযোগে ভারতের উদ্দেশে টাঙ্গাইল জেলা ত্যাগ করেন এবং ১৫ এপ্রিল আসামের ফুলবাড়ি হযে ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ভারতের কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী এবং আসামে মওলানা ভাসানীর এককালের সহকর্মী মইনুল হক চৌধুরী।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়ার উদ্দেশ্যে ভারতে প্রবেশের পর মুহূর্ত থেকে মওলানা ভাসানী তাঁর নিজের স্বাধীনতা খুইয়ে ফেলেছিলেন। 'নকশাল' ও পাকিস্তানী গুপ্তচরদের আক্রমণের মুখে তাঁর নিরাপত্তার অজুহাতে তাঁকে প্রহরাধীন রাখা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে সব সময় থাকতেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনো ব্রিগেডিয়ার কিংবা কোনো ম্যাজিস্ট্রেট। প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বাইরে তেমন কাউকেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হতো না। বিশেষ করে বামপন্থী কোনো নেতা-কর্মী কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত অনুসারীদের কেউ যাতে যেতে না পারেন সে বিষয়টি সর্বতোভাবে নিশ্চিত করা হয়েছিল। ন্যাপ সম্পাদক মশিউর রহমান, কৃষক নেতা কমরেড বরোদা ভূষণ চক্রবর্তী, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নেতা কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো এবং রাশেদ খান মেননসহ অনেকেই মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগ বা সাক্ষাৎ করতে পারেননি। মওলানা ভাসানীর বড় ছেলে আবু নাসের খানকেও জানানো হয়নি তাঁর ঠিকানা। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বামপন্থী ছাত্রনেতা তারিক আলীও লন্ডন থেকে এসে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন।

ভারতে ভাসানী সম্পর্কিত বিতর্ক

মওলানা ভাসানীর অবস্থান সম্পর্কে ভারতের লোকসভায়ও প্রশ্ন উঠেছিল। পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার ১৪ মে অভিযোগ করেছিলেন, মওলানা ভাসানীকে কলকাতাতেই কোথাও অন্তরীণ রাখা হয়েছে। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী বলেছিলেন, মওলানা ভাসানী কোথায় আছেন তা তিনি বা তার সরকার জানেন না। হরেকৃষ্ণ কোঙার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলেন, মওলানা ভাসানীর মতো বিশিষ্ট নেতার খোঁজ না জানার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি প্রশ্ন করেন, তাহলে কি মওলানা ভাসানী অন্তর্ধান করেছেন? সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী কি বাংলাদেশের লড়াইয়ের সহায়ক হবে? (দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ মে, ১৯৭১)

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ'-এর ২১ মে ১৯৭১ সংখ্যার প্রধান শিরোনাম ছিল 'ভাসানী কলকাতাতেই অন্তরীণ, কিন্তু সরকার নীরব!' সাপ্তাহিকটি 'ভাসানী সম্বন্ধে সরকার নীরব কেন?' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে লিখেছিল, '... রাজ্য সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব হইয়া থাকায় গোটা ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া আরও নানা জল্পনা-কল্পনা এবং গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হইতেছে।... সুতরাং আমরা রাজ্য সরকারের উদ্দেশে দাবী জানাইতেছি যে, অবিলম্বে তারা এই রহস্যজাল ভেদ করুন এবং ভাসানী সাহেবের নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করিয়া যে উদ্বেগ এবং সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে তা দূর করুন।... বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বর্ষীয়ান নেতা মওলানা ভাসানীকে আজকের সংগ্রামের ময়দানে যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখন তাকে অন্তরীণ রাখিতেছে কারা এবং কাদের স্বার্থে, বাংলার মানুষ আজ স্বভাবতই তা জানিতে চাহিবে। আজ

মুজিবুর (শেখ মুজিব) যখন কারাগারে তখন ভাসানীকে অন্যত্র আটকাইয়া বাংলাদেশের সংগ্রামকে কান্ডারীবিহীন করার জন্য এটা বৃহৎ কোন ষড়যন্ত্রের অঙ্গ কিনা আজ সেই সন্দেহও অনেকের মনে জাগিবে।...'

এ ধরনের বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব মওলানা ভাসানীর এবং বামপন্থীদের হাতে চলে যাওয়ার আশংকায় ভারতের ইন্দিরা গান্ধীর সরকার প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল। সেজন্যেই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তরীণ রাখা না হলেও নানা মিথ্যা অজুহাতে কঠোর প্রহরাধীন রাখা হয়েছিল। ভারতে প্রবাসের নয় মাসে মওলানা ভাসানীর দুই সঙ্গী মীর্জা মোরাদুজ্জামান এবং সাইফুল ইসলামের বিবরণী থেকেও একই তথ্য জানা যায় (দেখুন : সাইফুল ইসলামের গ্রন্থ, 'ভাসানী ভারত স্বাধীনতা' ঢাকা, ১৯৯৩)। বারবার অনুরোধ জানিয়েও মওলানা ভাসানী যুদ্ধকালে কখনো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কিংবা সীমান্তবর্তী এলাকায় যেতে পারেননি, পরিবর্তে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিল্লি, লছমনঝুলা, গীতাভবন, ঋষিকেশ এবং হরিদ্বারের মতো তীর্থস্থানগুলোতে। কখনো বা স্বাস্থ্যোদ্ধারের নামে রাখা হয়েছে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ এলাকা দেরাহদুনের নির্জন দুর্গে।

ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভারত সরকারের প্রহরাধীন থাকা সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা রেখেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তাঁর সে ভূমিকা সাংগঠনিক পর্যায়ের হতে পারেনি, তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল প্রচারণা চালানোর পথ। ভারতের সরকার ও জনগণের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানিয়ে তিনি তাঁর প্রচার অভিযান শুরু করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ধংসযজ্ঞের বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন, 'সাত কোটি বাঙ্গালীর মুক্তির বর্তমান সংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা আখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। আমি ঘোষণা করতে চাই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক-শোষকদের নগ্ন আক্রমণ এবং হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমরা ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছি।' বিবৃতিতে তিনি এই সংগ্রামকে সর্বান্তকরণে সমর্থনদান এবং বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য ভারতের সরকার ও জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন। (ইংরেজি দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১)

১৭ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে মওলানা ভাসানী সে সরকারের প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'সারা বিশ্বের শান্তিকামী গণতান্ত্রিক দেশের জনসাধারণ ও সরকারের প্রতি আমার আকুল আবেদন এই যে, যত শীঘ্র সম্ভব আপনারা নবগঠিত গণপ্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিউন।' (দৈনিক আনন্দাবাজার পত্রিকা, ২৩ এপ্রিল, ১৯৭১)

বিশ্বনেতৃবৃন্দের প্রতি আবেদন

১৯৭১ সালের ২১ এপ্রিল মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানোর আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্ট, গণচীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙ ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট লিও পোদগর্নি, প্রধানমন্ত্রী এলেক্সি কোসিগিন ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল ব্রেজনেভ, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জর্জ পম্পিডু, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল যোসেফ টিটো, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং আরব লীগের সেক্রেটারি জেনারেল আবদেল খালেক হাসাওনার কাছে পৃথক পৃথক তারাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। প্রতিটি তারবার্তায়ই তিনি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর গণহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং নারী নির্যাতনের কথা উলেখ করে অবিলম্বে এই অত্যাচার বন্ধে প্রভাব খাটানোর এবং নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি।

মাও সে তুঙ এবং চৌ এন লাই-এর প্রতি তারবার্তায় মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'সমাজতন্ত্রের আদর্শ হলো নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার আপনাদের সরবরাহকৃত আধুনিক অস্ত্রের সাহায্যে নির্দয়ভাবে নিরস্ত্র শ্রমিক কৃষক ছাত্র বুদ্ধিজীবী এবং নারী শিশুদের হত্যা করছে। আপনাদের সরকার এই হত্যাযজ্ঞের প্রতিকার না করলে গোটা বিশ্ব একথাই মনে করবে যে, আপনারা নির্যাতিত জনগণের বন্ধু নন।'

সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের প্রতি তারবার্তায় মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত আপনাদের দেশ ও জনগণ সব সময়ই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নির্যাতিত জনগণের দুর্দিনে বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক সমর্থন যুগিয়ে এসেছে। বাংলাদেশের জনগণের বর্তমান সংগ্রামেও আপনাদের সার্বিক সাহায্য আমরা আশা করি।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি তারবার্তায় মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'আপনার দেশের সরবরাকৃত অস্ত্রের সাহায্যে ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী বাংলাদেশে পাশবিক হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তাই একান্ত অনুরোধ, আপনি পাকিস্তানকে নতুন করে কোনো অস্ত্র সরবরাহ করবেন না। পাশাপাশি এমন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যও অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে অতীতে সরবরাহ করা অস্ত্র দিয়ে ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনী আর নিরস্ত্র বাঙালীদের হত্যা করতে না পারে।' (মওলানা ভাসানীর এসব তারবার্তার জন্য দেখুন, তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত 'স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র', ১৯৮২, চতুর্থ খন্ড, পৃ- ৪৭০-৭৬)।

যুদ্ধকালে জনগণের প্রতি আহ্বান

১৯৭১ সালের ২২ এপ্রিল এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের ২৩ বছরে পূর্ব বাংলা ও বাঙালীর দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের

যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন। লাহোর প্রস্তাবের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, 'সুতরাং আজিকার স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েমের যে সংগ্রাম শুরু হইয়াছে তাহা নতুন কিছু নহে। ইহা একটি জাতির বাঁচা-মরার প্রশ্নে পূর্ব স্বীকৃত প্রস্তাব বাস্তবায়নের মহান সংগ্রাম।' প্রচারপত্রে তিনি গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সমর্থন কামনা করেছিলেন। মওলানা ভাসানী ইসলাম ও পাকিস্তানের সংহতির নামে তৎপর দালালদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্যও সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। 'দালাল, বিশ্বসঘাতক ও মোনাফেক হইতে সাবধান হউন' শিরোনামে ৫ মে'র প্রচারপত্রে মওলানা ভাসানী ইসলামের নামে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলমাসহ পশ্চিম পাকিস্তানের আজ্ঞাবহ বিশ্বাসঘাতকদের স্বরূপ তুলে ধরে বলেছিলেন, '... নরপশু সৈনিকদিগের ছত্রছায়ায় এই দালালেরা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভিন্ন টালবাহানায় পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্থায়ী শোষণদাসে পরিণত করিতে সুচতুর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে।' ওই প্রচারপত্রে মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের চার হাজার ইউনিয়নে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার, গ্রামে গ্রামে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং সেন্টার খোলার, মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করার এবং মুক্তিযুদ্ধে যুবকদের যোগ দেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আপোস ও রাজনৈতিক সমাধানের বিরোধিতা

১৯৭১ সালের ১৫ মে এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছিলেন। দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন, শতকরা ৯৯ জনেরও বেশি মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে ভাট দেবে। বিবৃতিতে তিনি গণচীনের ভূমিকায় দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, সে দেশের নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে বর্তমান পরিস্থিতিতেও পাকিস্তানের সমর্থনে যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন তাতে বিশ্বাবাসী আর একথা বিশ্বাস করবে না যে, নির্যাতিত জনগণের প্রতি চীনের বিন্দুমাত্র মমত্ব আছে। (দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, ১৬ মে, ১৯৭১)

যদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র শুরু হলে মওলানা ভাসানী তার প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিতে হোসেন শহীদ সাহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এবং খন্দকার মোশতাক আহমদ ও হোসেন আলীসহ কতিপয় দক্ষিণপন্থী নেতা ও আমলা মুজিবনগরে অর্থাৎ কলকাতায় বসে পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে তৎপরতা চালিয়েছিলেন বলে জানা যায়। মওলানা ভাসানী এই ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করে ৩১ মে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন. বাংলাদেশের অধিবাসীদের সামনে দু'টি মাত্র বিকল্প রয়েছে– হয় পূর্ণ স্বাধীনতা, নাহলে মৃত্যু। তাঁর পরিষ্কার ঘোষণা ছিল, আপোস মীমাংসার পথে বাংলাদেশ সমস্যার কোনো সমাধান সম্ভব নয় এবং কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে তেমন উদ্যোগ নেয়া হবে অর্থহীন।

যারা রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছেন তাদের মনে রাখা উচিত যে, ২৩ বছরের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী এখন জীবন-সংগ্রামে নিয়োজিত। এত বিপুল ত্যাগকে আপোসের পথে নস্যাৎ করতে দেয়া হবে না। (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১ জুন, ১৯৭১)

সর্বদলীয় সরকারের বিরোধিতা

স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল পর্যায়ে জাতীয় ঐক্য রক্ষার প্রচেষ্টা ছিল মওলানা ভাসানীর আর এক উল্লেখযোগ্য অবদান। নিজেকে প্রধানমন্ত্রী করে মূলত এককভাবে তাজউদ্দিন আহমদ প্রবাসী সরকার গঠন করেছিলেন। খন্দকার মোশতাক আহমদ ছাড়াও শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি, মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানসহ অন্য কয়েকজন নেতা পদটির জন্য আকাংক্ষী ছিলেন বলে জানা যায়। এজন্য তারা তৎপরতাও চালিয়েছিলেন। ফলে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে মতপার্থক্য ও সংঘাত ছিল প্রথম থেকেই। পাশাপাশি ছিলেন 'মস্কোপন্থী' দুই নেতা মনি সিং এবং মোজাফফর আহমদ। বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি সোভিয়েত সহানুভূতিকে চাপ হিসেবে কাজে লাগিয়ে তারাও মন্ত্রী হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ফলে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ এবং একে সর্বদলীয়করণের জন্য প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। এতে বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক ও গণচীনের বন্ধুরাষ্ট্র হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতি চেয়েছিল সত্য, কিন্তু প্রথমেই বাংলাদেশের পক্ষ নেয়নি। ভারতকে একটি সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ করার কৌশল হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরং ভারতের সঙ্গে দরকষাকষি শুরু করেছিল।

১৯৬৯ সালে সংঘটিত চীন-সোভিয়েত যুদ্ধের পর থেকেই এ জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু ভারত সম্মত হয়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত জড়িয়ে পড়ার পর ওই সামরিক চুক্তিকে সমর্থনের পূর্বশর্ত বানিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ভারতেরও তখন পাশ কাটানোর সুযোগ ছিল না। ফলে ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট স্বাক্ষরিত হয়েছিল ২৫ বছর মেয়াদী ভারত-সোভিয়েত 'মৈত্রী চুক্তি'। এই চুক্তি ছিল ভারতের ওপর সোভিয়েত কূটনীতির বিরাট বিজয়। এটা স্বাক্ষর করায় ভারত অনেকাংশে নির্ভরশীল রাষ্ট্রেও পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধই ছিল অন্তরালের প্রধান নির্ধারক। 'মৈত্রী চুক্তি'র আগে পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে 'পূর্ব পাকিস্তান' বলেছে এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকে 'শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের' জন্যও তাগিদ দিয়েছে। সোভিয়েত মনোভোবে পরিবর্তন ঘটেছিল 'মৈত্রী চুক্তি'র পর। ভারতের ইন্দিরা সরকারের ইঙ্গিতে মুজিবনগণ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে মস্কোপন্থীদের দুই প্রধান নেতা মণি সিংহ ও মোজাফফর আহমদকে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী চেয়েছিলেন এর মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নকে খুশি করতে, যাতে ভারতের প্রতি সোভিয়েতের মনোভাবে পরিবর্তন ঘটে। এ অবস্থারই সুযোগ নিয়ে তাজউদ্দিন আহমদকে চ্যালেঞ্জকারীদের সঙ্গে উসকানিদাতার ভূমিকায় নেমেছিলেন সেকালের মস্কোপন্থীরা।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের তথা মুজিবনগর সরকারের সে সংকটকালে আরো একবার প্রকৃত দেশপ্রেমিক জাতীয় নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। ৩০ মে এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ে জাতীয় বা সর্বদলীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ আমি সমর্থন করি না। কেননা এর ফলে নেতৃত্ব নিয়ে সংঘাত সৃষ্টি হবে এবং তা আমাদের সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয়, যা পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্রকে শক্তিশালী করবে।' (দৈনিক স্টেটসম্যান, ১ জুন, ১৯৭১)

উপদেষ্টা পরিষদে

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে প্রবাসী সরকার সর্বদলীয় সরকারের বিকল্প হিসেবে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের কৌশল গ্রহণ করে। মস্কোপন্থী নেতা মণি সিং-মোজাফজফরদের সন্তুষ্ট করার পাশাপাশি মওলানা ভাসানী সম্পর্কিত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটানোও ছিল এর উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে আয়োজিত উপদেষ্টা পরিষদের একমাত্র বৈঠকে মওলানা ভাসানীকে সভাপতিত্ব করতে দেয়া হয়। তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে সর্বদলীয় সরকার গঠনের বিরোধিতা করেন এই যুক্তিতে যে, মোজাফফর আহমদের মতো অন্য যারা এতে অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী তাদের প্রত্যেকেই ১৯৭০-এর নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন, অনেকের জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ফলে তারা মন্ত্রী হলে বা সরকারে যোগ দিলে সে সরকার সম্পর্কেই জনমনে বিভ্রান্তি ও হতাশার সৃষ্টি হবে। জানা যায়, মওলানা ভাসানী তাদের মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন পরিত্যাগ করে যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। এভাবে প্রধানত মওলানা ভাসানীর হস্তক্ষেপের ফলেই সে সময় প্রবাসী সরকার অনিবার্য বিপর্যয়ের পরিণতি থেকে রেহাই পেয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধও পেরেছিল ঐক্যবদ্ধভাবে পরিচালিত হতে।

ভারতে অবস্থানকালে মওলানা ভাসানী একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলেন। 'চমৎকার আতিথেয়তার জন্য' ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি প্রতিবারই তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। জবাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 'উপযুক্ত সময়ের জন্য' অপেক্ষা করতে বলেছেন। জানা যায়, বিভিন্ন সময় চিঠির মাধ্যমেও মওলানা ভাসানী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে একই অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

মওলানা ভাসানীর ভূমিকায় মুল্যায়ন

এভাবেই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়ের দিন পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়েই মওলানা ভাসানী জনগণ ও স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর অগ্রবর্তী ভূমিকা অব্যাহত রেখেছিলেন। 'আসসালামু আলাইকুম' উচ্চারণের মাধ্যমে কেবল নয়, ১৯৭০ সালের ৩০ নভেম্বর সরাসরি স্বাধীনতার আহ্বানও তিনিই প্রথম জানিয়েছিলেন। তথাপি স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলোতে তিনি নেতৃত্বের অবস্থানে আসতে পারেননি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বই তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল। এই পরিণতির কারণ পর্যালোচনা করা দরকার।

স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক আন্দোলনকালে ১৯৫০-এর দশকেই মওলানা ভাসানী এর সাথে সামন্তবাদ, বৃহৎ পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে সমন্বিত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর কারণ, তিনি সঠিকভাবেই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, মুক্তির সংগ্রাম এক সমগ্র সংগ্রাম, শোষণের কোনো একটি কারণকেও আক্রমণের বাইরে রাখা যাবে না। কৃষক সমিতি গঠনের সাথে সাথে শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নিয়ে এবং তাকে উৎসাহিত করে তিনি শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে সমগ্র সংগ্রামকেই সফল করতে চেয়েছিলেন। স্বায়ত্তশাসন অর্জনের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রশ্নে তিনি ন্যাপ-এর মাধ্যমে চেয়েছিলেন আন্দোলনকে প্রশ্নাতীত রাখতে।

বামপন্থীদের ব্যর্থতা

চীন-রাশিয়ার মতাদর্শগত বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৭ সালে ন্যাপে বিভক্তি ঘটার পর মওলানা ভাসানী বামপন্থী সেই অংশটিকে সঙ্গে পেয়েছিলেন– যারা শান্তিপূর্ণ পন্থার পরিবর্তে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার করতেন, প্রচারণা চালাতেন। কিন্তু ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান মওলানা ভাসানী জন্য প্রচণ্ড হতাশা বয়ে এনেছিল। তত্ত্ব আর বাগাড়ম্বরে অগ্রগামী তাঁর বামপন্থী অনুসারীরা সেবারের চমৎকার বিপ্লবী পরিস্থিতিতেও দুর্ভাগ্যজনক ব্যর্থতা দেখিয়েছিলেন। এই ব্যর্থতা এবং অন্যদিকে বাঙালী বুর্জোয়াদের অর্থ, সাম্রাজ্যবাদের আনুকূল্য আর সাধারণভাবে পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব রাতারাতি শেখ মুজিবকে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। ফলে মওলানা ভাসানীকে সংগ্রামের পথ থেকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল, আন্দোলন হারিয়ে গিয়েছিল ষড়যন্ত্র আর আপোসের অন্ধকারে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বকে অপ্রতিহত হওয়ার সুযোগ দিয়ে বামপন্থীরা এরপর বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের নামে নেতৃত্বের সংঘাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরিণতিতে চারটি প্রধান উপদলের সৃষ্টি হয়েছিল। এদের সবাই ১৯৬৯ সালেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার লক্ষ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মসূচি হাজির করেছিল। শ্রেণী সংগ্রামের নামে কেউ কেউ জোতদার খতমের অভিযানও শুরু করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে যখন বিপ্লব তথা স্বাধীনতা যুদ্ধ আরম্ভ করার পরিস্থিতি

সৃষ্টি হলো, তখন এরা যুদ্ধের চরিত্র বিশ্লেষণে বেশি মনোযোগী হলেন। কেউ বললেন একে সাম্রাজীবাদী চক্রান্তের ফল, কেউ বা এতে পেলেন রুশ-ভারতের গভীর ষড়যন্ত্র। বামপন্থীদের একটি বিরাট অংশ অন্যায় এবং ভুল পথে যাত্রা করলেন। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর চাইতে এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন। 'সঠিক' বামপন্থীরা কলকাতায় গঠন করলেন 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। যোগাযোগবিহীন অবস্থায়ও মওলানা ভাসানীকে বানালেন এর চেয়ারম্যান। অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের কোনো পর্যায়েই ভাসানী অনুসারী বামপন্থীরা স্বাধীনতা ও জনগণের পক্ষে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেননি।

সবার আগে স্বাধীনতা

নিজের সহযোগী এই বামপন্থীদের সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর জ্ঞান ও ধারণায় কোনো ভ্রান্তি ছিল না বলেই তিনি তাদের ওপর নির্ভরতার মতো বোকামি করেননি। দেশ আর নির্যাতিত জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর মমত্ব ছিল সুগভীর, দুর্দিনে তাই তিনি একাই পা বাড়িয়েছিলেন। মার্কসবাদী না হলেও তিনি এই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, জাতীয় প্রশ্ন সুতীব্র হয়ে উঠলে তাকে পাশ কাটিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া যায় না। এ কারণেই তিনি সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে পাকিস্তান ভাঙনের গুরুতর কথাটিকে আইনসঙ্গত করার প্রয়োজনে তাঁকে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকে অবলম্বন করতে হয়েছিল। এ কারণেই তিনি প্রথমে পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ বলার পরিবর্তে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলেছিলেন।

মওলানা ভাসানী তাই বলে সমাজতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করেননি। ১৯৭১ সালের ৭ জানুয়ারি তিনি স্বাধীনতার লক্ষ্যে যে পাঁচ দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেছিলেন তার দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছিল, 'এবং স্বাধীনতার সত্যিকার ফলভোগের লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই যে একমাত্র পথ– একথা গ্রামে গ্রামে প্রচার করা।' ১৭ মার্চ চট্টগ্রামে তিনি বলেছিলেন, 'প্রথমে প্রধান ইস্যু তথা স্বাধীনতা সম্পর্কে মীমাংসা করা হবে। পরে যদি দেখা যায়, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি তখন আবার সংগ্রাম শুরু করা যাবে।' যুদ্ধকালীন বিভিন্ন বিবৃতিতেও তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

সমাজতন্ত্রকে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে স্থির রেখে তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং এটাই ছিল বিজ্ঞানসম্মতভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত। এরই পাশাপাশি মার্কসবাদী না হয়েও তিনি শেখ মুজিবের অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন এবং ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সঙ্গে আপোস আলোচনার বিরোধিতা করেছেন এবং ঘটনা প্রবাহকে সশস্ত্র সংঘাতের অনিবার্য ও যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মওলানা ভাসানীর এই সঠিক সিদ্ধান্ত ও অবদানের কথা খোলা মনেই স্বীকার করা প্রয়োজন।

দুই প্রকার দুশমনের মোকাবিলা করিতে হইবে

নির্বাচনে বিজয়ের আনন্দে পূর্ব বাংলার জনগণকে ভুলিয়ে রেখে যখন পাকিস্তানের ক্ষমতা যাওয়ার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র চলছিল মওলানা ভাসানী তখন স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর প্রচারণাকে ক্রমাগত সর্বাত্মক করেছিলেন। দেশের সকল অঞ্চলে সভা-সমাবেশের পাশাপাশি সময়ের প্রয়োজনে তিনি হাতে কলমও তুলে নিয়েছিলেন। নির্ভুল ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মতো বিরল কয়েকটি রচনার একটিতে এ সময় তিনি লেখেন : 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলনে আমাদিগকে দুই প্রকার দুশমনের মোকাবিলা করিতে হইবে। প্রথমটি হইল পশ্চিমা প্রতিরোধকারী মহল। দ্বিতীয়টি হইল পূর্ব পাকিস্তানেরই বিশ্বাসঘাতক কিংবা সুবিধাবাদী মহল। বিশ্বাসঘাতকেরা গোড়া হইতেই আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে। সুবিধাবাদীরা স্বাধীনতাকামী সাজিয়া সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তিমুখী আন্দোলনের মোড় পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিবে। প্রথম প্রকারের শত্রুকে জানমালের বিনিময়েই খতম করিতে হইবে। কারণ, তাহারা ধস্তাধস্তিতে বিশ্বাস করে এবং বেনিয়াসুলভ কায়দায় যে কয়দিনই পারে লুটপাট করিয়া যাইবার ইচ্ছা পোষণ করে। দ্বিতীয়তঃ দেশী গোষ্ঠীকে প্রতিরোধ করিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঠিক মুল্যবোধে উদ্দীপিত জনতার হাতে নেতৃত্বদান করিতে হইবে। এই কাজ প্রতিযোগিতার নয়। ইহাতে দরকার শুধু সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের প্রভাবমুক্ত বলিষ্ঠ মানসিকতার।

'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বরূপ সাম্য ও মুক্তির আদলে রচিত হইবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীততে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানী ইতিহাসের পাতায় সেনালী দিনের যোজনা করিবে।' (সাপ্তাহিক 'মাতৃভূমি', ২৩ জানুয়ারি, ১৯৭১)

উপসংহার

স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে মওলানা ভাসানী দেশ ও জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ব্যক্তিগত বা দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থকে কখনো প্রাধান্য বা প্রশ্রয় দেননি। ধারাবাহিক নির্যাতন, দলীয় ভাঙন এবং সহযোগীদের দলত্যাগের মতো কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি জনগণের আন্দোলনে গতিশীল নেতৃত্ব দিয়েছেন। দিক-নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি জড়িত রেখেছেন নিজেকেও। দেশের স্বাধীনতার জন্যে শেষ পর্যন্ত ভারতের কাছে নিজের স্বাধীনতা তুলে দিয়েও তিনি অবিচল থেকেছেন, তবু স্বাধীনতা যজ্ঞে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেননি। এখানেই মওলানা ভাসানীর শ্রেষ্ঠত্ব, এখানেই তাঁর দেশপ্রেমের মাহাত্ম্য।

প্রথম প্রকাশ : সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা', স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা, মার্চ, ১৯৮৬। সংশোধিত আকারে দ্বিতীয় প্রকাশ : শাহ আহমদ রেজা সম্পাদিত মাসিক 'অনুসরণ', মার্চ, ১৯৯৪ সংখ্যা।

মওলানা ভাসানীর ফারাক্কা মিছিল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে কয়েকটি ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ও দিক-নির্ধারণী হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়ে রয়েছে, মওলানা ভাসানীর ফারাক্কা মিছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। মৃত্যুর মাত্র ছয় মাস আগে, ৯৬ বছর বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়ে ১৯৭৬ সালের ১৬ মে মওলানা ভাসানী এই ঐতিহাসিক মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ফারাক্কা মিছিল সে সময়ে জাতীয় স্বার্থে খুবই ফলপ্রসূ অবদান রেখেছিল। এখনো ফারাক্কা মিছিলের তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবন করা দরকার। কারণ, ভারতের যে পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী মিছিলটির আয়োজন করেছিলেন, সে পানি আগ্রাসন এখনো অব্যাহত তো রয়েছেই, ক্রমাগত আরো ব্যাপক ও ভয়ংকরও হয়ে উঠছে। ভারত আমাদের শুধু পানির ন্যায্য হিস্যা থেকেই বঞ্চিত করছে না, বাংলাদেশকে পানি-প্রতিবন্ধী রাষ্ট্রেও পরিণত করতে চাচ্ছে। সুতরাং ফারাক্কা মিছিলের ইতিহাস স্মরণ করার পাশাপাশি বেশি গুরুত্বের সঙ্গে দরকার ভারতের পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলা। জাতিকে পানি-প্রতিবন্ধী হওয়ার মারাত্মক পরিণতি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা চালানো।

প্রথমে ফারাক্কা মিছিলের কথা সেরে নেয়া যাক। কৃষক-শ্রমিক ও বিভিন্ন শ্রেণীর মেহনতী মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মি, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক-অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত লাখ লাখ নারী-পুরুষ সে মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দানে মওলানা ভাসানীর দেয়া মাত্র ১০ মিনিটের এক ভাষণের মধ্য দিয়ে মিছিলের শুরু হয়েছিল। রাজশাহী, প্রেমতলী, নবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জ হয়ে কানসাটে গিয়ে ১৭ মে মিছিলের সমাপ্তি টেনেছিলেন মওলানা ভাসানী। পায়ে হেঁটে দু'দিনে প্রায় একশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলেন মিছিলকারীরা। কানসাট হাই স্কুল ময়দানের সমাবেশে মিছিলের সমাপ্তি ঘোষণার আগে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, গঙ্গার পানিতে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যার ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার জন্য আমাদের আন্দোলনের এখানেই শেষ নয়। ফারাক্কা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের আহ্বান জানিয়ে মওলানা ভাসানী আরো বলেছেন, 'ভারত সরকারের জানা উচিত, বাংলাদেশীরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। কারো হুমকিকে পরোয়া করে না।... যে কোনো হামলা থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করা আমাদের দেশাত্মবোধক কর্তব্য এবং অধিকার।'

ফারাক্কা মিছিল কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। মওলানা ভাসানীর পক্ষ থেকেও ছিল না কোনো বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক কর্মসূচী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা

যুদ্ধে সমর্থন দেয়ার যুক্তিকে সামনে এনে স্বাধীনতা-উত্তর প্রাথমিক দিনগুলো থেকেই ভারতের সম্প্রসারণবাদী সরকার ও তার এদেশী সহযোগীরা বাংলাদেশকে অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা ও সহযোগিতার সুযোগে গোপন ও প্রকাশ্য বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত ভারতের ইচ্ছার অধীনস্থ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে আরো এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালের ১৬ মে দু' দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী নতুন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। এ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বেরুবাড়ি ভারতকে দেয়া হয়েছিল এবং একই সাথে ভারত পেয়েছিল ফারাক্কা বাঁধ চালু করার প্রশ্নে বাংলাদেশের সম্মতি। বাংলাদেশের জন্য মরণ বাঁধ হিসেবে চিহ্নিত ফারাক্কা বাঁধ চালু করার লক্ষ্যে ভারতের পক্ষ থেকে প্রথমে চাতুরিপূর্ণ কৌশল নেয়া হয়েছিল। মুজিব-ইন্দিরার যুক্ত ইশতেহারে বলা হয়েছিল, ফারাক্কা বাঁধ সম্পূর্ণরূপে চালু করার আগে শুষ্ক মৌসুমে প্রাপ্ত পানির ব্যাপারে পরস্পরের কাছে গ্রহণযোগ্য বণ্টন-সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য ভারত পরীক্ষামূলকভাবে ফিডার ক্যানেল চালু করবে। যুক্ত ইশতেহারের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত ১৯৭৫ সালে ৪১ দিনের জন্য (২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত) ফারাক্কা বাঁধ চালু করেছিল। কথা ছিল, ৪১ দিনের নির্ধারিত সময়ে ভারত ১১ হাজার থেকে ১৬ হাজার কিউসেক পানি ফিডার ক্যানেল দিয়ে হুগলী নদীতে নিয়ে যাবে। কিন্তু ৪১ দিনের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরও ভারত ফিডার ক্যানেল দিয়ে পানি প্রত্যাহার অব্যাহত রাখে এবং বাংলাদেশের সাথে কোনো সমঝোতা বা চুক্তি না করেই '৭৬ সালের শুষ্ক মৌসুমে একতরফাভাবে গঙ্গায় পানি নিয়ে যায়। ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়। ভারতের একতরফা পানি প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সর্বনাশ সূচিত হয়।

দেশ ও জাতির সেই সংকটকালে অভয় ও আশ্বাসের বাণী মুখে এগিয়ে এসেছিলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ভারতের শাসকগোষ্ঠী বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে তিনি প্রথম থেকেই ফারাক্কা বাঁধের বিরোধিতা করেছেন, দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশকে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা দেয়ার জন্য। এই প্রক্রিয়ায় তিনি ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির কঠোর বিরোধিতা করেছেন এবং এক বিবৃতিতে ভারতকে বেরুবাড়ি না দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। ১৯৭৪ সালের ১৭ মে প্রদত্ত ওই একই বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, 'সাম্প্রতিক শীর্ষ সম্মেলনে ফারাক্কা বাঁধের পানি বণ্টনের মীমাংসা বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য হায়াত ও মউতের প্রশ্ন ছিল। কিন্তু এর কোন মীমাংসা করা হয় নাই।'

১৯৭৬ সালের শুষ্ক মৌসুমে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটে। একদিকে ভারতের পক্ষ থেকে একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে সৃষ্ট সংকট এবং অন্যদিকে সীমান্তে সশস্ত্র আক্রমণ ও সামরিক তৎপরতার ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারত-

বাংলাদেশ সম্পর্কে শীতল হয়ে পড়ে। এ কথা প্রচারিত হতে থাকে যে, '৭৫-এর রাজনৈতিক পরিবর্তনকে ভারত সরকার সুনজরে দেখেনি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই সুপরিকল্পিতভাবে সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের এই সম্প্রসারণবাদী কর্মকান্ড মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী '৭৬ সালের জানুযারি মাস থেকে ব্যাপকভাবে সীমান্ত এলাকা সফর করেন। সন্তোষে ফিরে এক বিবৃতিতে তিনি অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে বলেন, 'আক্রমণের কলাকৌশল ও ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা দেখিলে যে কোনো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকই স্বীকার করিবেন যে, সাধারণ দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা এই কাজ সম্ভব নহে; বরং ইহা অভিজ্ঞ ও দক্ষ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে।' (৮ ফেব্রুযারি, ১৯৭৬) মওলানা ভাসানী এ সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে চিঠি লেখেন এবং নিজের চোখে সীমান্ত পরিস্থিতি দেখে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। '৭৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এক 'খোলা চিঠি'তে ইন্দিরা গান্ধীকে নিজের কন্যা হিসেবে সম্বোধন করে মওলানা ভাসানী লেখেন– "আমার আন্তরিক আশা, আপনি স্বচক্ষে দেখিলেই ইহার আশু প্রতিকার হইবে এবং বাংলাদেশ ও হিন্দুস্থানের মধ্যে ঝগড়া-কলহের নিষ্পত্তি হইয়া পুনরায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কায়েম হইবে। ফারাক্কা বাঁধের দরুণ উত্তরবঙ্গের উর্বর ভূমি কিভাবে শ্মশানে পরিণত হইতেছে তাহাও স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।"

উদাত্ত আহ্বান জানানো সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ার পরই মওলানা ভাসানী ফারাক্কা মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন। ফারাক্কাকবলিত উত্তরবঙ্গ সফর শেষে '৭৬ সালের ১৮ এপ্রিল ঢাকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে মওলানা ভাসানী এক জনসমাবেশের আয়োজন করেন। সমাবেশে তিনি ঘোষণা করেন, 'গঙ্গা আন্তর্জাতিক নদী। ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিধান অনুযাযী ভারত এককভাবে এই নদীর পানি ব্যবহার করতে পারে না।' ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির তারিখ ১৬ মে ফারাক্কা মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করে সমাবেশে মওলানা ভাসানী আরো বলেন, 'ভারত সরকার পানি প্রত্যহারের মাধ্যমে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের ন্যায্য অধিকারের উপর হামলা চালালে বাংলাদেশের আট কোটি মানুষ তা জীবন দিয়ে প্রতিরোধ করবে।'

ফারাক্কা মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণার পাশাপাশি মওলানা ভাসানী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠিতে তিনি ফারাক্কা সমস্যার সমাধান এবং বাংলাদেশকে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন ৪ মে। মওলানা ভাসানীর চিঠিতে তিনি 'ব্যথিত ও বিস্মিত' হয়েছেন জানিয়ে ইন্দিরা গান্ধী লিখেছিলেন– 'এ কথা কল্পনাও করা যায় না যে, যিনি আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নিজের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে দুঃখ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে শরিক

হয়েছেন, সেই তিনি এখন কিভাবে এতটা মারাত্মকরূপে আমাদের ভুল বুঝেছেন, এমনকি প্রশ্ন তুলেছেন আমাদের উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে।' ১৫৬ কোটি রুপি ব্যয়ে নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ পরিত্যাগ করা সম্ভব নয় জানিয়ে ইন্দিরা গান্ধী মওলানা ভাসানীকে আরো লেখেন– 'আমার মনে হয়, বাংলাদেশের উপর ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনাকে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত এবং শুধু একটি দিকের তথ্য জানানো হয়েছে। আপনি যদি চান তাহলে আমাদের হাই কমিশনার নিজে গিয়ে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টির অন্য পিঠ সম্পর্কে অবহিত করবেন।' চিঠির শেষাংশে ইন্দিরা গান্ধী লেখেন– 'আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলতে চাই, যে কোনো যুক্তিসঙ্গত আলোচনার জন্য আমাদের দরজা খোলা থাকবে। কিন্তু কারো একথা মনে করা উচিত নয় যে, ভারত কোনো হুমকি বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অযৌক্তিক দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করবে।'

চিঠির শেষে 'শ্রদ্ধাসহ আপনার একান্ত ইন্দিরা গান্ধী' লিখলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর চিঠিতে মওলানা ভাসানীর অনুরোধ উপেক্ষিত হয়েছিল এবং বিশেষ করে শেষ বাক্যে দেয়া হয়েছিল প্রচ্ছন্ন হুমকি। জবাবে ইন্দিরা গান্ধীকে মওলানা ভাসানী লিখেছিলেন, 'পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমি আপনার মনোভাবের প্রশংসা করি। কিন্তু সে সমাধান হতে হবে স্থায়ী ও ব্যাপকভিত্তিক। এই সমাধান শুধু শুষ্ক মৌসুমের জন্য হলে চলবে না, বছরব্যাপী পানির প্রবাহ একই পরিমাণ হতে হবে।'

১৬ মে অনুষ্ঠিত ফারাক্কা মিছিল ছিল মওলানা ভাসানীর সমগ্র কর্মসূচির একটি অংশ। '৭৬ সালের ১৮ এপ্রিল কর্মসূচি ঘোষিত হওয়ার পর সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, আওয়ামী লীগ এবং ভারতপন্থী কয়েকটি মাত্র রাজনৈতিক দল ছাড়া, সকলে সমবেত হয়েছিল মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে। 'চলো চলো ফারাক্কা চলো' স্লোগান মুখে সারাদেশ থেকে নারী-পুরুষ গিয়েছিল রাজশাহী, ফারাক্কা মিছিলের সূচনাস্থলে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ মিছিল ফারাক্কা অভিমুখে কানসাট পর্যন্ত গিয়ে থেমেছিল বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে। এই মিছিলের আতঙ্কে ভারত সরকার রীতিমত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের দরিদ্র নিরস্ত্র মানুষের ভয়ে ভারতকে যখন সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করতে হয়েছে, তখন তার অবিলম্বে ফারাক্কা সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসা উচিত।'

এ কথা সত্য যে, ভারতের বৃহৎ প্রতিবেশীসুলভ এবং সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের কারণে মওলানা ভাসানীর ফারাক্কা মিছিল সমস্যার স্থায়ী সমাধান অর্জন করতে পারেনি, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মূলত এই মিছিলের জনপ্রিয়তা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর ব্যাপক প্রচারণার ফলেই ভারতকে বহুদিন পর বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে হয়েছিল। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে জনগণের ঐক্য সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সাহস যুগিয়েছিল। তিনি ১৯৭৬ সালেই জাতিসংঘে ফারাক্কার প্রশ্ন তুলে

ধরেছিলেন। সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটির ২৪ নভেম্বরের সর্বসম্মত বিবৃতির ভিত্তিতে ভারত ও বাংলাদেশের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়েছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন পর ১৯৭৭ সালের ৫ নভেম্বর ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল 'ফারাক্কা চুক্তি'। আংশিকভাবে হলেও স্বীকৃত হয়েছিল গঙ্গার পানির ওপর বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকার। বাংলাদেশের অনুকূলে 'গ্যারান্টি ক্লজ' ছিল চুক্তিটির উল্লেখযোগ্য বিষয়। 'গ্যারান্টি ক্লজ' থাকায় ভারত কখনো যথেচ্ছভাবে পানি প্রত্যাহার করতে কিংবা বাংলাদেশকে কম হিস্যা দিতে পারেনি। (উল্লেখ্য, অবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছিল ১৯৯৬ সালে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আগত আরেক আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর সরকার ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। স্বাক্ষরিত হওয়ার পর পর, ১৯৯৭ সালের মার্চেই ভারত চুক্তি লংঘন করেছিল। সর্বনিম্ন পরিমাণ পানি পাওয়ার রেকর্ডও স্থাপিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালের মার্চেই– ২৭ মার্চ বাংলাদেশ পেয়েছিল মাত্র ছয় হাজার ৪৫৭ কিউসেক। এখনো বাংলাদেশকে বঞ্চিত করে চলেছে ভারত।)

'ফারাক্কা চুক্তি'র মাধ্যমে গঙ্গার পানির ওপর বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকারের স্বীকৃতি অর্জন ছিল মওলানা ভাসানীর ফারাক্কা মিছিলের প্রত্যেক্ষ অবদান। ফারাক্কা মিছিলের কারণে শুধু নয়, মওলানা ভাসানী স্মরণীয় হয়ে আছেন জাতির সঙ্কটকালে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসার কারণেও। ৯৬ বছর বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, নতিস্বীকার করেননি কোনো হুমকির কাছে। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি দেশপ্রেমিক প্রধান জাতীয় নেতার অবস্থানে থেকেছেন এবং ভারতের শোষণমূলক সম্প্রসারণবাদী নীতি ও বাংলাদেশকে ইচ্ছাধীন করার কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ফারাক্কা মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন, সে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীসহ ভারতীয়রা হুমকি দিয়ে এবং সীমান্তে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়েও মওলানা ভাসানীকে এক চুল পরিমাণ টলাতে পারেনি। সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও ফারাক্কা মিছিলের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী গঙ্গার পানির ওপর বাংলাদেশের দাবি ও অধিকার আদায় করার পথ দেখিয়ে গেছেন।

ভাসানীর প্রতি ইন্দিরা গান্ধীর এবং ইন্দিরার প্রতি মওলানা ভাসানীর চিঠি

ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে, ফারাক্কা সমস্যার সমাধান করার আহ্বান জানিয়ে মওলানা ভাসানী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে চিঠি লেখেন ১৮ এপ্রিল। ইন্দিরা গান্ধী উত্তর দেন ৪ মে। চিঠির বক্তব্য মওলানা ভাসানীকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। নিজের প্রতিক্রিয়া এবং আরো একবার সমস্যা সমাধানের আহবান জানিয়ে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন। নিচে মওলানা ভাসানী ও ইন্দিরা গান্ধীর সেই চিঠি দুটি প্রকাশ করা হলো।

ইন্দিরা গান্ধীর চিঠি :

প্রিয় মওলানা সাহেব,

আপনার ১৮ এপ্রিল, ১৯৭৬-এর চিঠি পড়ে আমি ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছি।

একথা কল্পনা করাও কষ্টকর যে, যিনি আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের নিজের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে দুঃখ ও আত্মত্যাগে শরিক হয়েছেন, সেই তিনি এখন কিভাবে এতটা গুরুত্বসহকারে আমাদের ভুল বুঝেছেন, এমনকি প্রশ্ন তুলেছেন আমাদের উদ্দেশ্যের সততা সম্পর্কে।

আমি একথাই বিশ্বাস করতে চাই যে, অবিভক্ত ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার বিভিন্ন প্রকাশ্য বিবৃতি এবং ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে মিছিলের নেতৃত্ব দেয়ার হুমকি– এ সবই তাৎক্ষণিক উত্তেজনাপ্রসূত।

কোনো একজন বাংলাদেশীও কি সত্যিকারভাবে একথা বিশ্বাস করেন, যে ভারত নজিরবিহীন দ্রুততার সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে তার সশস্ত্র বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, সেই ভারত তার প্রতিবেশীর প্রতি কোনো শত্রুতামূলক উদ্দেশ্য মনে পোষণ করতে পারে?

ভারতের সরকার ও জনগণ চায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাদের সমর্থন এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কাজে সহযোগিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে তাদের মুল্যায়ন করা হোক। আমাদের নিজেদের প্রয়োজন বিশাল এবং জনগণের ওপর বোঝার পরিমাণও বিপুল, কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে, আমাদের দু' দেশের জনগণের কল্যাণ পরস্পর-সম্পর্কিত।

আমাদের সাধারণ স্বার্থের জন্য প্রয়োজন এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা এবং দু' দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা।

আপনি নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ১৫৬ কোটি রুপি ব্যয়ে যে ফারাক্কা বাঁধ নির্মিত হয়েছে এবং পূর্ব ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা বন্দরকে বাঁচানোর একমাত্র মাধ্যম যে বাঁধটি, সেই বাঁধ পরিত্যাগ করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি নিশ্চয়ই একথাও জানেন যে, শুধু গ্রীষ্মকালে দু'মাসের মতো সময়ে প্রমত্ত গঙ্গায় পানি স্বল্পতা দেখা দেয়। পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতা থাকলে ভবিষ্যতে শুষ্ক মৌসুমে যৌথ প্রয়োজন মেটানোর উপায় নিশ্চিতভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব। এজন্যই আমরা নিজেদের প্রয়োজন অস্বীকার করে, এমনকি হুগলিকে স্বল্পতম পরিমাণ পানিও না দিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে পানির প্রবাহ বজায় রেখেছি। আমার মনে হয় যে, বাংলাদেশের ওপর ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনাকে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত এবং শুধু একটি দিকের তথ্য জানানো হয়েছে। আপনি যদি চান তাহলে আমাদের হাই কমিশনার নিজে গিয়ে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টির অন্য পিঠ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

প্রতিবেশীদের মধ্যে মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, সমঝোতা ও সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে সমাধান লাভের চেষ্টা করতে হবে। পরস্পরের বিরুদ্ধে মোকাবেলা ও শত্রুতার পথ অনুসরণ করে আমরা কেবল একে অন্যের ক্ষতিই সাধন করতে পারি। সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে আমি আরো একবার বলতে চাই যে, আমরা চাই, বাংলাদেশ তার স্বাধীনতাকে সংহত করুক এবং শান্তিপূর্ণভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যাক। আমাদের দিক থেকে প্রতিবেশী হিসেবে আমরা সব সময় এ ব্যাপারে অবদান রাখার চেষ্টা করবো এবং বাংলাদেশের অগ্রগতিতে অংশীদার হবো।

আপনি হয়তো অবহিত আছেন যে, আমাদের দুই সরকারের পক্ষ থেকে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গায় পানি বণ্টন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্নে আলোচনা শুরু করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন উভয় দেশের শুভ বুদ্ধি ও ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষের উৎসাহ ও সমর্থন।

আমি আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলতে চাই, যে কোনো যুক্তিসঙ্গত আলোচনার জন্য আমাদের দরোজা খোলা থাকবে, কিন্তু কারো একথা মনে করা উচিত নয় যে, ভারত কোনো হুমকি বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অযৌক্তিক দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

শ্রদ্ধাসহ
আপনার একান্ত
ইন্দিরা গান্ধী
৪ মে ১৯৭৬

মওলানা ভাসানীর চিঠি

প্রিয় শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী,

আপনার ৪ মে ১৯৭৬-এর চিঠিটি নতুন কিছু নয়, বরং ফারাক্কা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের সরকারি ভাষ্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র, যা আমি খ্যাতনামা পূর্বপুরুষ মতিলাল নেহরুর নাতনী এবং পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরুর কন্যা হিসেবে আপনার কাছ থেকে আশা করিনি। আপনি নিজেও সব সময় বঞ্চিত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় এবং তাদের জন্য সকল ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করেছেন।

আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সময় সাহায্য করার জন্য আমি আপনার এবং ভারতের মহান জনগণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

ফারাক্কার প্রশ্নে আমি আপনাকে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীর জেলাগুলো সফর করার এবং আমাদের কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের সাধিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণ

করার জন্য আরো একবার আমার অনুরোধের পুনরুল্লে খ করছি। কেবল সরকারি কর্মচারীদের দেয়া তথ্যের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করার জন্য আপনার প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ, এ ধরনের তথ্যে সব সময় বিদ্যামান পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরা হয় না।

এই কারণে গঙ্গার পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করার ফলে সাধিত ক্ষয়ক্ষতি দেখার জন্য আমি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ ব্যাপকভাবে সফর করেছি। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে আমি আপনার মনোভাবের প্রশাংসা করি। কিন্তু সে সমাধান হতে হবে স্থায়ী ও ব্যাপকভিত্তিক। এই সমাধান শুধু শুষ্ক মৌসুমের দুই মাসের জন্য হলে চলবে না, সারা বছর ধরে পানির প্রবাহ একই পরিমাণ হতে হবে।

এই পন্থায় ও ভিত্তিতে ফারাক্কা সমস্যার সমাধান করার জন্য আমি আপনাকে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার তারবার্তা পাঠিয়েছি।

যার সঙ্গে বাংলাদেশের সাড়ে তিন কোটি মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত, সেই ফারাক্কা সমস্যার সমাধান আমলা বা সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে করা সম্ভব নয়। এজন্য দু' দেশের রাজনৈতিক নেতাদের অবশ্যই অলোচনায় বসতে হবে এবং গ্রহণযোগ্য সমাধান অর্জন করতে হবে।

সংঘাত ও শত্রুতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমি আরো একবার আপনার প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করুন এবং এমন একটি সমাধান খুঁজে বের করুন, যা আট কোটি বাংলাদেশীর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

আপনি যদি আমার এই অনুরোধ রক্ষা না করেন তাহলে সমস্যার সমাধান অর্জনের জন্য আমি নির্যাতিত জনগণের নেতৃবৃন্দ তথা আপনার পূর্বপুরুষ ও মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষার ভিত্তিতে আমার ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কর্মসূচি নির্ধারণ করতে বাধ্য হবো।

আমি আরো একবার আমার দিক থেকে এই ভয়ংকর সমস্যার সমধান এবং দু' দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিচ্ছি।

শুভেচ্ছাসহ
আপনার একান্ত
মোঃ আবদুল হামিদ খান ভাসানী

সূত্র : 'মওলানা ভাসানী ও ফারাক্কা মিছিল' (ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিলের সপ্তদশ বার্ষিকী উপলক্ষে সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত স্মারক ১৯৯৪, পৃ. ৬২-৬৩। চিঠি দুটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন শাহ আহমদ রেজা।

মওলানা ভাসানীর অনশন ও সেকালের রাজনীতি

আমাদের উপমহাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি পন্থা বা কৌশল হিসেবে অনশন ধর্মঘটের প্রয়োগ ও বিকাশ ঘটেছে বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে। অনশন হলো বিশেষ কোনো দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে সব ধরনের পানাহার বর্জন করা। এর ফলে অনশনকারীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, কখনো কখনো তার মৃত্যুর আশংকা দেখা দেয়। সে অবস্থায় সরকার ভীত হয়ে পড়ে বলে দাবি আদায়ের আন্দোলনও শক্তিশালী হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকালে বিভিন্ন পর্যায়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নেতা মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেকেই অনশন করেছেন। মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন উপমহাদেশের অনশনকারী নেতাদের মধ্যে অন্যতম। ব্রিটিশ যুগে তিনি তিনবার অনশন করেছেন, চারবার অনশনের মধ্য দিয়ে তিনি পাকিস্তানের রাজনীতিতে অনশনকারী প্রধান নেতায় পরিণত হয়েছেন। জীবনের শেষ অনশন করেছেন তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে।

পাকিস্তানের এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতা মওলানা ভাসানীর মতো এতবার এবং এত বেশি দিন ধরে অনশন করেননি। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি আটবার অনশন করেছেন, অনশনে কাটিয়েছেন মোট ৫৬ দিন। অনশনের সবচেয়ে কম মেয়াদ ছিল তিনদিন, আর দীর্ঘতম অনশন ছিল ১৭ দিনের। প্রচলিত ধারার অনশনের বাইরেও একবার তিনি একটানা ৬১ দিন রোজা রেখেছিলেন।

কেন অনশন করেন– এ প্রশ্নের উত্তরে মওলানা ভাসানী ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে বলেছেন, 'আমি অনশন করি শোষিত মানুষের মুক্তি-সংগ্রামকে আগাইয়া লইবার জন্য। এ যুগে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শোষক গোষ্ঠীর নিকট গুরুত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে জানিয়াও আমাকে অনশনে যাইতে হয় এই জন্যই যে, দুর্দশা চরমে উঠিলেও জনতা আজও কাহারও নিকট পায় নাই মুক্তির নিশ্চিত আশ্বাস। আমি তাহাদেরই সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি, যাহারা প্রকৃত অর্থেই বিপ্লবী, যাহারা আনিবে জনতার সার্বিক মুক্তি।' (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সন্তোষ থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা, 'ভাসানীর অনশন', এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ.-২৬)

মহারাজা বিরোধী সংগ্রাম ও প্রথম অনশন

মওলানা ভাসানী জীবনের প্রথম অনশন করেন ১৯৩২ সালে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন বিরোধী আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি একইযোগে তিনি কৃষক-

জনতার প্রত্যক্ষ শোষক জমিদার-মহারাজাদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। সেগুলোর সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন। জমিদার-মহারাজা বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে প্রথমে ময়মনসিংহ জেলা থেকে এবং পরবর্তীকালে ১৯২৬ সালের শেষদিকে তাঁকে বঙ্গ বা বাংলা প্রদেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

সে পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানীর রাজনেতিক জীবনের নতুন পর্যায়ের শুরু হয়েছিল পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আসামে। আসামেও তিনি তাঁর জমিদার-মহারাজা বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন, এগিয়ে নিয়েছিলেন পর্যায়ক্রমে। এই আন্দোলনেরই একটি পর্যায়ে তাঁকে গৌরিপুরের মহারাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছিল। সেকালের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গৌরিপুরে হিন্দু মহারাজারা বংশানুক্রমে কৃষক-প্রজাদের ওপর নির্মম শোষণ-নির্যাতন চালাতেন, খাজনা না দেয়ার অভিযোগে বাড়ি ও জমি থেকে উচ্ছেদ করতেন। এমনকি নিজেদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে হত্যাও করতেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষক-প্রজাদের ওপর চলতো নির্যাতন। ওদিকে বিশেষ করে মুসলমানদের ওপর চালানো হতো সাম্প্রদায়িক নির্যাতন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে, এমনকি পবিত্র ঈদ-উল আজহার সময়ও মুসলমানরা গরু জবাই বা কোরবানী করতে পারতেন না।

গৌরিপুরের মহারাজার এ ধরনের শোষণ-নির্যাতনের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। আন্দোলনের প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি শোষণ-নির্যাতন বন্ধ করার জন্য, কৃষক-প্রজাদের প্রতি সদয় ও মানবিক আচরণ করার জন্য মহারাজা প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়ার প্রতি আবেদনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে আবেদন উপেক্ষিত হয়েছে, উল্টো মওলানা ভাসানীর জীবননাশের হুমকি দেয়া হয়েছে এবং নানাভাবে চেষ্টাও করা হয়েছে তাঁকে হত্যা করার জন্য।

হত্যার হুমকিসহ সার্বিক শোষণ-নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং জমিদার-মহারাজা বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী অনশন শুরু করেছিলেন ১৯৩২ সালে। তাঁর এই অনশনের প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল দ্রুততার সঙ্গে। গৌরিপুরের মহারাজার শাসনাধীন অঞ্চল ছাড়িয়ে বাংলা-আসামের বিভিন্ন এলাকায় জমিদার-মহারাজা বিরোধী আন্দোলন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষক-প্রজারা একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন নেতার অনশনের সঙ্গে। মওলানা ভাসানীর মৃত্যুর আশংকায় বিশেষ করে গৌরিপুর অঞ্চলের উপজাতীয়সহ কৃষক-প্রজারা ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। তারা এমনকি সশস্ত্র প্রতিরোধেরও পরিকল্পনা করেছিলেন।

উদ্বিগ্ন কৃষক-প্রজারা মওলানা ভাসানীর প্রতি অনশন প্রত্যাহার করে নেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। একই অনুরোধ জানাতে কোলকাতা থেকে আসামের ধুবড়িতে এসেছিলেন কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল

হক। এসেছিলেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারাও। আন্দোলনরত উদ্বিগ্ন কৃষক-প্রজাসহ আগত নেতাদের অনুরোধে সাতদিন পর মওলানা ভাসানী তাঁর জীবনের প্রথম অনশন ভেঙেছিলেন।

অনশন ভাঙার পরপর মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এক বিশাল কৃষক-প্রজা সম্মেলন। হিন্দু-মুসলমানদের পাশাপাশি গারো, রাবা ও খাসিয়াসহ উপজাতীয়রাও সে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। কোলকাতা থেকে এসেছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হকসহ বিশিষ্ট নেতারা। তিন লাখের বেশি কৃষক-প্রজার সমাবেশ ঘটেছিল সে সম্মেলনে, চারশ'র বেশি গরু ও ছাগল জবাই করা হয়েছিল যোগদানকারীদের খাওয়ানোর জন্য। সেকালের এই সম্মেলন সম্পর্কে মওলানা ভাসানী পরবর্তীকালে, ১৯৬৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, '... সম্মেলনে মরহুম শেরে বাংলা ও পাক-ভারতের তিনশ' বিখ্যাত নেতা যোগদান করেন। গৌরিপুরের মহারাজা প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়া মুসলমান প্রজাদেরকে গরু জবেহ করিতে দিতেন না। যদি কেহ গরু জবেহ করিত, তবে তাহাকে বাড়ি-জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইত। ভাসানচরের সম্মেলনে লাখ লাখ লোককে গৌরিপুরের মহারাজের বে-আইনী আদেশের বিরুদ্ধে ৭ হাজার মণ চাউলের ভাত ও ৩৯৬টি গরু জবেহ করিয়া খাওয়ানো হয় এবং গৌরিপুরের মহারাজের বে-আইনী আদেশের অবসান ঘটানো হয়। সম্মেলনের বিরাট খরচ গরীব জন-সাধারণই বহন করিয়াছিল।' (দেখুন, 'সংগ্রামী জননেতা মওলানা ভাসানী', মোশারফ উদ্দীন ভূইয়া ও আবুল ওমরাহ মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন সম্পাদিত সংকলন, প্রকাশক : শফিউর রহমান খান, চলন্তিকা বইঘর, ঢাকা, জানুয়ারি ১৯৭০, পৃ.-২৬-২৭)

কৃষক-প্রজাদের এত বিশাল সম্মেলন এবং সেখানে বিশেষ করে গরু জবাই করার এই অকল্পনীয় ঘটনা গৌরিপুরের মহারাজার জন্য ছিল এক মারাত্মক চপেটাঘাতের মতো। তিনি এর ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং খাজনার পীড়ন ও ঋণের দায় থেকে কৃষক-প্রজাদের অনেকাংশে অব্যাহতি দেন। যুগ যুগ ধরে চলে আসা নির্যাতনও এরপর কমে আসে, মুসলমানরা অর্জন করেন গরু জবাই করার অধিকার। সাত দিনব্যাপী অনশন এবং বিশাল কৃষক-প্রজা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এভাবেই মওলানা ভাসানী কৃষক-প্রজার অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে প্রচন্ডতা দিয়েছিলেন। মাথা নত করতে বাধ্য করেছিলেন এতদিন পর্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারী জমিদার-মহারাজাদের।

মওলানা ভাসানীর এই সফল আন্দোলন বাংলা-আসামের অন্য অঞ্চলগুলোতেও কৃষক-প্রজাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। দু' প্রদেশের বিভিন্নস্থানে এরপর শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে এবং জমিদার-মহারাজারা ক্রমাগত পিছিয়ে গেছেন ও ছাড় দিয়েছেন। মওলানা ভাসানীর অনশন ও সম্মেলন

সার্বিকভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকেও শক্তি ও গতিবেগ যুগিয়েছিল। ১৯৩৭ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বাংলায় কৃষক-প্রজা পার্টির বিরাট বিজয় এবং শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠনের পেছনেও এ দু'টি ঘটনার ছিল প্রত্যক্ষ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

(সূত্র : সন্তোষে এই লেখকের কাছে মওলানা ভাসানীর নিজের বর্ণনা, এপ্রিল, ১৯৭৪; এস এম রেজা, 'অনশনের রাজনীতি ও মওলানা ভাসানী', প্রাগুক্ত পুস্তিকা 'ভাসানীর অনশন', এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ.-১২-১৩; সৈয়দ আবুল মকসুদ, 'ভাসানী', জানুয়ারি, ১৯৮৬, পৃ.-৮৯-৯০)

আসামে বাঙালীর সংগ্রাম ও দ্বিতীয় অনশন

মওলানা ভাসানী দ্বিতীয়বার অনশন করেন ১৯৩৫ সালে। এবার অনশনের উপলক্ষ ছিল ব্রিটিশ ও আসাম সরকারের দুটি আইন ও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ। এই আইন ও সিদ্ধান্তের কারণ তৈরি হয়েছিল আসামে বাঙালীদের বসবাসের পরিপ্রেক্ষিতে। বিশ শতকের প্রথম দশক তথা ১৯১০ সালের দিক থেকে ময়মনসিংহ, রংপুর, কোচবিহার, ত্রিপুরা ও সিলেটসহ বিভিন্ন অঞ্চলের লাখ লাখ ভূমিহীন ও গরিব কৃষক আসামের জঙ্গলে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিল। আসামের গোয়ালপাড়া, তেজপুর, নওগাং, দারং ও কামরূপ জেলার গভীর ও দুর্গম জঙ্গল পরিষ্কার করে বাঙালী কৃষকরা চাষাবাদ ও বসবাস করতে থাকে। প্রথমদিকে দুটি প্রধান কারণে আসাম সরকার বাঙালীদের স্বাগত জানিয়েছিল : এক. সেকালের প্রাণনাশী অসুখ কালাজ্বরে মৃত্যুর ফলে আসামের জনসংখ্যা দ্রুত কমে গিয়েছিল; এবং দুই. বিপজ্জনক জন্তুর বিচরণ ক্ষেত্র জঙ্গল পরিষ্কার করে বাঙালীদের চাষাবাদের ফলে খাদ্যোৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি সরকারের ভূমি রাজস্ব আয়ও অনেক বেড়েছিল। বাঙালী কৃষকদের এই অবদান সত্ত্বেও ১৯২০-এর দশকের শেষদিক থেকে আসামে বাঙালী বিরোধী উদ্যোগ ও তৎপরতা শুরু হয়েছিল। স্বার্থান্বেষী অসমীয় ভূস্বামীদের প্ররোচণায় এবং দিলিকেন্দ্রিক ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনে আসাম সরকার 'লাইন প্রথা' নামের এমন এক আইন প্রবর্তন করেছিল, যার ফলে নির্দিষ্ট কিছু এলাকার বইরে বাঙালীদের বসবাস নিষিদ্ধ হয়ে যায়, ভূমির বন্দোবস্ত পাওয়া থেকেও বঞ্চিত হতে থাকে বাঙালীরা। 'লাইন প্রথা' আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর একইযোগে শুরু হয়েছিল 'বাঙ্গাল খেদা' অভিযান। স্বার্থান্বেষী অসমীয়াদের পাশাপাশি আসাম সরকারও প্রত্যক্ষভাবে বাঙালীদের বিতাড়নের অভিযানে অংশ নিয়েছিল। আসাম সরকারের পুলিশ নিষ্ঠুর অত্যাচারের মাধ্যমে বাঙালীদের উচ্ছেদ করতো, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতো তাদের ঘর-বাড়ি। কোনো কোনো অঞ্চলে হাতি দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হতো বাঙালীদের গ্রামীণ আবাসিক এলাকা।

আসামে যাওয়ার পর থেকেই মওলানা ভাসানী বাঙালী কৃষকদের স্বার্থবিরোধী 'লাইন প্রথা' এবং 'বাঙ্গাল খেদা' অভিযানের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি বাঙালী কৃষক-জনতাকে সংগঠিত করেন এবং গঠন করেন 'আসাম চাষী-মজুর সমিতি'। পর্যায়ক্রমে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ও কৃষক-প্রজা পার্টিকেও তিনি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে মওলানা ভাসানীর 'লাইন প্রথা' ও 'বাঙ্গাল খেদা' বিরোধী আন্দোলন প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, প্রদেশের রাজধানী গৌহাটিসহ বাঙালী অধ্যুষিত জেলা ও মহকুমাগুলোতে মিছিল-সমাবেশ হতে থাকে প্রতিদিন। অমন একটি প্রতিবাদ মিছিলে আসাম সরকারের পুলিশ গুলি চালায়, তিনজন আন্দোলনকারীর মৃত্যু ঘটে এবং আহত হয় ২৫ জন। পুলিশ মিছিল থেকে অসংখ্য নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে, প্রদেশের অন্য অনেক এলাকা থেকেও গ্রেফতার করা হয় আন্দোলনরত নেতা-কর্মীদের।

হত্যা ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবিতেই মওলানা ভাসানী তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অনশন করেছিলেন ১৯৩৫ সালে। তিনি সেই সঙ্গে 'লাইন প্রথা' বাতিল এবং 'বাঙ্গাল খেদা' অভিযান বন্ধ করারও দাবি জানিয়েছিলেন। এবারের অনশনও চলমান আন্দোলনকে আরো প্রচণ্ড করেছিল, আলোড়ন তুলেছিল ব্রিটিশ ভারতের অন্য সব অঞ্চলে। মওলানা ভাসানীর সমর্থনে আরো একবার এগিয়ে এসেছিলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। তিনি আসাম সরকারের নির্যাতনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন এবং তার ফলে মুক্তি পেয়েছিলেন বন্দী নেতা-কর্মীরা। ফজলুল হকসহ মুসলিম নেতাদের অনুরোধে মওলানা ভাসানী ১৩ দিন পর অনশন ভেঙেছিলেন।

মওলানা ভাসানীর ১৩ দিনব্যাপী এই অনশনের চাপে আন্দোলনরত বন্দী নেতা-কর্মীদের মুক্তি দেয়ার পাশাপাশি বাঙালীদের ওপর নির্যাতন কমিয়ে আনতেও বাধ্য হয়েছিল আসাম সরকার। 'লাইন প্রথা' বাতিল না হলেও স্তিমিত হয়েছিল 'বাঙ্গাল খেদা' অভিযান। আসামে বসবাসরত বাঙালীদের বৈধ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল এবং আসামের প্রাদেশিক আইন পরিষদে বাঙালীদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছিল নয়টি আসন। এ রকম একটি আসনে মওলানা ভাসানী ১১ বছর সদস্য বা এমএলএ ছিলেন। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে সেকালের বাঙালী কৃষকদের আন্দোলনকে যুক্ত ও সংহত করা ছিল মওলানা ভাসানীর অন্য এক উল্লেখযোগ্য অবদান। পরবর্তীকালে আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে 'লাইন প্রথা' বাতিল করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। দাবিটিকে তিনি আসামের আইন পরিষদেও প্রধান একটি আলোচ্যসূচিতে পরিণত করেছেন। 'লাইন প্রথা' নিয়ে বিতর্ক চলেছে বছরের পর বছর, ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত। নিজের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ আসামে প্রাদেশিক সরকার গঠন করার পরও মওলানা ভাসানী তাঁর আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন। সে আন্দোলন একযোগে চলেছে পরিষদের ভেতরে ও বাইরে।

তৃতীয় অনশন ও ৬১ দিনের রোজা

১৯৪২ সালের ২৫ আগস্ট আসামে মুসলিম লীগ দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতাসীন হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন স্যার মুহাম্মদ সাদুল্লাহ (সে সময় প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো)। মুসলিম লীগ করলেও প্রধামন্ত্রী ছিলেন অসমীয়া, ফলে তার শাসনকালেও মওলানা ভাসানীকে আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হয়েছিল। প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির একাধিক সভার প্রস্তাবে 'লাইন প্রথা' বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে (যেমন, ১৯৪৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর), কিন্তু গড়িমসি করেছেন প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লাহ। অন্যদিকে আন্দোলনকে ক্রমাগত প্রচণ্ডতা দিয়েছেন মওলানা ভাসানী এবং প্রধানত তাঁর সে ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপেই সরকারকে আইনে পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। 'লাইন প্রথা' বাতিল করা না হলেও ১৯৪৫ সালের ১৩ জুলাই আসাম সরকার এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, ১৯৩৮ সালের ১ জানুয়ারির আগে পর্যন্ত যে বাঙালীরা আসামে এসেছে তারা আসামের বৈধ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং অহমীয়দের মতো তাদেরও ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

এই স্বীকৃতি ও অধিকার আদায় বিরাট বিজয় হলেও সম্পূর্ণ 'লাইন প্রথা' আইন বাতিলের দাবিতে মওলানা ভাসানী আন্দোলন এগিয়ে নিয়েছেন। সে আন্দোলন প্রচণ্ডতা পেয়েছিল মুসলিম লীগ সরকারের পতন এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদ বাতিল হওয়ার পর। ১৯৪৬ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি গোপীনাথ বড়দলুইকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত কংগ্রেস মন্ত্রিসভা নতুন পর্যায়ে বাঙালী বিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু করেছিল। এই পর্যায়ে ১৯৩৮ সালের ১ জানুয়ারির পর আগত বাঙালীদের উচ্ছেদ শুরু হয়, নিষ্ঠুর নির্যাতনের পাশাপাশি জ্বালিয়ে দেয়া হতে থাকে বাঙালীদের ঘরবাড়ি। প্রতিবাদে আরো একবার আন্দোলন গড়ে তোলেন মওলানা ভাসানী এবং আন্দোলনের অংশ হিসেবে শুরু করেন অনশন। ১৯৪৬ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত ৬১ দিনব্যাপি এবারের অনশন ছিল অন্য প্রকৃতির। আমরণ অনশনের ঘোষণা দিয়ে শুরু করলেও ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে মওলানা ভাসানীর প্রতি অনশন ভাঙার অনুরোধ আসতে থাকে, অনুরোধ আসে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতাদের পক্ষ থেকেও। কোলকাতার মুসলিম মহিলাদের পক্ষ থেকে তারবার্তার মাধ্যমে প্রেরিত এরকম একটি অনুরোধে বলা হয়, "আমাদের মতো লাখ লাখ জীবনের চেয়ে একজন আবদুল হামিদ খানের (তখনও তিনি 'ভাসানী' নামে পরিচিতি পাননি) জীবনের মুল্য অনেক বেশি। অনশনের পরিবর্তে অন্য কোনো পথে আন্দোলন করুন।"

বিভিন্ন মহলের চাপ ও অনুরোধে কয়েকদিনের মধ্যে অনশন ভাঙলেও তিনি দিনের বেলা পানাহার থেকে বিরত থাকেন এবং ইসলাম ধর্মের বিধানের অনুসরণে অনির্দিষ্টকাল রোজা রাখতে শুরু করেন। মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেছিলেন, আসাম সরকার বাঙালী কৃষকদের উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ না করা পর্যন্ত তিনি রোজা রাখতে থাকবেন। সেবার অন্য বছরের চাইতে আগেই বর্ষা শুরু হয়েছিল, ফলে

স্থগিত হয়েছিল সরকারের উচ্ছেদ অভিযান। মওলানা ভাসানী অনশনধর্মী রোজা রাখার সমাপ্তি টেনেছিলেন ৬১ দিন পর।

অনশন ভাঙার পরদিন থেকেই তিনি আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙালীদের পুনর্বাসিত করার আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বাঙালীরা আবার ঘরবাড়ি তৈরি করেছে, বসবাস ও চাষাবাদ করেছে। এর ফলে আরো একবার নেমে এসেছে সরকারি দমন-নির্যাতন, সেই সঙ্গে প্রচণ্ডতা পেয়েছিল মওলানা ভাসানীর আন্দোলনও। সে আন্দোলন অব্যাহত ছিল ব্রিটিশ শাসনের শেষদিন তথা ১৯৪৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত। আন্দোলনকালে মওলানা ভাসানীকে বিভিন্ন পর্যায়ে নির্যাতনকবলিতও হতে হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সঙ্গে 'লাইন প্রথা' বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টাকালে আটবার তাকে গ্রেফতারবরণ করতে হয়েছে, পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময়, ১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্টও তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। সিলেট জেলাকে পাকিস্তানের অংশে নিয়ে আসাও ছিল মওলানা ভাসানীর আন্দোলন ও প্রচেষ্টার এক প্রধান সুফল। সিলেটের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে তিনি গণভোট অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়েছিলেন এবং এই দাবিতে ১৯৪৬ সালের ১০ জুন পর্যন্ত ৮৮ দিনব্যাপি আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এভাবেই ব্রিটিশ ভারতে মওলানা ভাসানী শোষিত-নির্যাতিত কৃষক-জনতার আন্দোলন সংগঠিত করেছেন এবং আন্দোলনের অংশ হিসেবে অনশনের কৌশল অবলম্বন করেছেন। মওলানা ভাসানীর প্রতিটি অনশনই তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী সুফল অর্জন করেছিল। এই সাফল্যই তাঁকে মেহনতী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মহান নেতার সম্মান এনে দিয়েছিল। (দ্বিতীয় অনশন থেকে বিভিন্ন ঘটনার জন্য দেখুন : এস এম রেজা, প্রগুক্ত, পৃ.-১৩; সৈয়দ আবুল মকসুদ; প্রগুক্ত, পৃ. ৮১-৯২ এবং 'মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ.-৩৫-৬০; 'লাইন প্রথা' বিরোধী আন্দোলন, আসাম প্রাদেশিক আইন পরিষদের কার্যক্রম ও আসামের তৎকালীন রাজনীতিসহ মওলানা ভাসানীর ভূমিকার জন্য দেখুন ভারতীয় দুই গবেষক বিমল জে দেব এবং দিলিপ কুমার লাহিড়ির নিবন্ধ 'দ্য লাইন সিস্টেম ইন আসাম : এ স্টাডি অব দ্য রোল অব মওলানা ভাসানী', জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, আগস্ট, ১৯৭৮, পৃ.-৬৪-৯৮)

পাকিস্তানের রাজনীতিতে অনশন

পাকিস্তানে মওলানা ভাসানী প্রথম অনশন করেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময়। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পর তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল সরকার। মওলানা ভাসানী আদালতে হাজির হয়ে গ্রেফতার বরণ করেছিলেন ১০ এপ্রিল (১৯৫২)। কারাগারেও তাঁর সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। রাষ্ট্রভাষা ও স্বায়ত্তশাসনসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দাবি পূরণ

এবং আন্দোলনকালে গ্রেফতার করা রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি আদায়ের জন্য মওলানা ভাসানী এ সময় নতুন ধরনের অনশন শুরু করেন। সারাদিন তিনি রোজা রাখতেন অর্থাৎ পানাহার করতেন না। অনশন ভাঙতেন সন্ধ্যার পর। তাঁর অনুপ্রেরণায় অন্য বন্দিদের অনেকেও একইভাবে অনশন শুরু করেন। রাজবন্দি অলি আহাদ ও ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন, মওলানা ভাসানীর পরামর্শে তারা ৩৫ দিন রোজা রেখেছিলেন এবং এর ফলে কারাগারের ভেতরে-বাইরে বন্দিদের মুক্তির জন্য আন্দোলন জোরদার হয়েছিল। পর্যায়ক্রমে অনেকে মুক্তিও পেয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল ১৯৫৩ সালের ২১ এপ্রিল। রোজা রাখার ধারাবাহিকতায় ১৮ এপ্রিল থেকে তিনি আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। এতে তাঁর শরীর খারাপ হতে থাকে, সে খবর প্রকাশিত হলে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। জনমতের চাপে সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, এরও আগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কারাগারে মওলানা ভাসানী একদিনের অনশন করেছিলেন।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানী দ্বিতীয়বার অনশন করেন ১৯৫৬ সালের ২ মে। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকায় দেশের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ছিল পাকিস্তানের রাজনীতিতে মওলানা ভাসানীর প্রধান এক অবদান। আওয়ামী লীগ ও শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টিসহ কয়েকটি দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে সর্বাত্মকভাবে পরাজিত করেছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ নির্বাচনী কর্মসূচি ২১ দফা আদায়ের ঘোষিত অঙ্গিকারকে পাশ কাটিয়ে নির্বাচনের পর থেকে বাঙালীর নেতারা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের ষড়যন্ত্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মওলানা ভাসানী ছাড়া উল্লেখযোগ্য সব নেতাই জড়িত হয়েছিলেন ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে। এর ফলে যুক্তফ্রন্টে ভাঙন ঘটেছে, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারা অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি অব্যাহত থেকেছে। ষড়যন্ত্রের পথ বেয়েই ১৯৫৫ সালের ৬ জুন প্রদেশে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতাসীন হয়েছিল ফজলুল হকের যুক্তফ্রন্ট। এই সরকারে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ অংশ নেয়নি, মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন কেএসপির আবু হোসেন সরকার। (সেকালের রাজনীতি সম্পর্কে জানার জন্য পড়ুন শাহ আহমদ রেজার গ্রন্থ 'ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম,' গণপ্রকাশনী, ১৯৮৬)।

পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণকবলিত প্রদেশ পূর্ব বাংলায় সে সময় তীব্র খাদ্যাভাব দেখা দেয়, শোনা যেতে থকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। সে পরিস্থিতিতে বাঙালীর প্রধান নেতা মওলানা ভাসানী খাদ্যের দাবিতে দুর্বার গণআন্দোলন শুরু করেন। তিনি বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ৫০ কোটি

টাকা বরাদ্দের দাবি জানান। নিজের এই দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের ২ মে থেকে ঢাকায় মওলানা ভাসানী অনশন শুরু করেন। তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানসহ নেতৃবৃন্দ তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান অনশন শুরুর চারদিন পর।

মওলানা ভাসানীর এই অনশন খাদ্য আন্দোলনকে প্রচণ্ডতা দিয়েছিল, ভীত হয়ে পড়েছিল বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অব.) ইস্কান্দার মির্জার নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মওলানা ভাসানীর দাবি অনুযায়ী ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার ঘোষণা দেন। মওলানা ভাসানীর অন্য এক দাবি মেনে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় আরো বলা হয় যে, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'সুপ্রিম ফুড কাউন্সিল'ও গঠন করা হবে। তাৎক্ষণিকভাবে টাকা দেয়া হয় প্রাদেশিক সরকারকে এবং সে কারণে ১৭ দিন পর, ১৯৫৬ সালের ১৮ মে মওলানা ভাসানী তাঁর অনশন ভাঙেন। এটা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ অনশন। (দেখুন, শাহ আহমদ রেজা, প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৩; এম রফিক আফজাল, 'পলিটিক্যাল পার্টিজ ইন পাকিস্তান', ইসলামাবাদ, জুন, ১৯৭৬, পৃ.-১৯১; সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত– ২, পৃ.-১২১-২৩)

কেন্দ্রের দেয়া অর্থে খাদ্য আমদানির মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ ঠেকানোর আশু দাবি আদায়ে সাফল্যের পাশাপাশি মওলানা ভাসানীর ১৭ দিনের অনশন পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতিতেও দূরপ্রসারী অবদান রেখেছিল। অনশন প্রত্যাহারের পরপর খাদ্য সংকটের সমাধান, যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে মওলানা ভাসানী নতুন পর্যায়ে আন্দোলন শুরু করেন। গণতন্ত্রী দল ও ন্যাশনাল কংগ্রেসসহ পাঁচটি বিরোধী দল সে আন্দোলন যোগ দেয়। প্রেসিডেন্টের নির্দেশে খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয় সেনাবাহিনীকে, মওলানা ভাসানী তখন ব্যর্থতার অভিযোগে কেএসপির আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন। সরকারের পদত্যাগ ও খাদ্যের দাবিতে প্রদেশব্যাপী আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে, পুলিশের গুলিতে ঢাকার চকবাজার এলাকায় মারা যায় তিনজন আন্দোলনকারী। পরদিন, ১৯৫৬ সালের ৫ আগস্ট ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মওলানা ভাসানী দু'মাইল দীর্ঘ বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন। ৪ সেপ্টেম্বর গভর্নর ফজলুল হকের পুলিশ ভূখা মিছিলে গুলি চালালে চারজন নিহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় বিচলিত গভর্নর ফজলুল হকের আহবানে প্রদেশে মওলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে ৬ সেপ্টেম্বর, মুখ্যমন্ত্রী হন আতাউর রহমান খান। ওদিকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পবিরর্তনের প্রভাবে পাকিস্তানের কেন্দ্রেও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভর পতন ঘটে। ১৯৫৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। (সেকালের ঘটনাপ্রবাহের জন্য দেখুন, শাহ আহমদ রেজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৫)।

আওয়ামী লীগ সরকারের বিচ্যুতি এবং পঞ্চম অনশন

মওলানা ভাসানী তাঁর জীবনের পঞ্চম অনশন করেছিলেন ১৯৫৭ সালের ১ জুন। পাকিস্তানের কেন্দ্রে ও পূর্ব বাংলার ক্ষমতায় তখন আওয়ামী লীগ, ফলে সে দলেরই সভাপতি মওলানা ভাসানীর এই অনশন দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ক্রমাগত দলের ও নিজেদের অঙ্গিকার থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। ফলে পূর্ব বাংলার দুর্দশা আওয়ামী লীগের শাসনকালেও অব্যাহতই ছিল। পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায় এবং জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের ঘোষিত দলীয় নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্রুয়ারি মওলানা ভাসানী ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন আয়োজন করেছিলেন। এই সম্মেলনে প্রধামন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, শাসনতন্ত্রে অর্থাৎ সংবিধানে পূর্ব বাংলাকে 'শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছে।'

ক্ষমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেও প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী প্রকৃত সত্যকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কারণ, ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে সংবিধান পাস করার সময় স্বায়ত্তশাসনের বিধান না থাকার অভিযোগে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে একই সোহরাওয়ার্দী ওয়াক আউট করেছিলেন। স্বায়ত্তশাসনের পাশাপাশি পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নেও প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী দলের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচি বিরোধী অবস্থান নিয়েছিলেন। ফলে কাগমারী সম্মেলনে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাত প্রকাশ্যে চলে আসে এবং দলের সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, বাঙালীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধ না করা হলে দশ বছর পর এমন সময় আসতে পারে যখন পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানাবে। বলা দরকার, এটা ছিল স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা।

কাগমারী সম্মেলন থেকেই আওয়ামী লীগে অনানুষ্ঠানিক বিভক্তি ঘটেছিল এবং একদিকে স্বায়ত্তশাসন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির দাবিতে মওলানা ভাসানী আন্দোলনকে গতিবেগ দিয়েছিলেন, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী স্বার্থান্বেষীদের সক্রিয় সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ক্ষমতাসীনরা মওলানা ভাসানীকে বানিয়েছিলেন সর্বাত্মক আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। ওদিকে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীনদের বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও দুর্দশাকবলিত পূর্ব বাংলায় সে সময় আরো একবার মারাত্মক খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়, বিভিন্ন জেলায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। খাদ্যের দাবিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বগুড়ায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠান করাসহ বিভিন্নভাবে মওলানা ভাসানী আন্দোলন এগিয়ে নিতে থাকেন এবং সে আন্দোলনেরই এক পর্যায়ে, ১৯৫৭ সালের ১ জুন থেকে তিনি অনশন শুরু করেন।

মওলানা ভাসানীর দাবিতে আটটি দলের সমন্বয়ে মে মাসের শেষদিকে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন খাদ্য কাউন্সিলকে সক্রিয় করার এবং পূর্ব বাংলার জন্য জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য আমদানির আশ্বাসসহ ক্ষমতাসীন নেতাদের উপর্যুপরি অনুরোধ এবং

অন্য সব দল ও মহলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানী সেবার ৭ জুন তাঁর সপ্তাহব্যাপি অনশন ভেঙেছিলেন। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটায় এবারও তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

খাদ্য আমদানি করতে সরকারকে বাধ্য করার মাধ্যমে অবহেলিত প্রদেশ পূর্ব বাংলার জনগণকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করা ছিল মওলানা ভাসানীর সপ্তাহব্যাপি অনশনের আশু সাফল্য। তাঁর এই অনশনের ফলে ঘোষিত অঙ্গিকার থেকে বিচ্যুত আওয়ামী লীগ নেতাদের স্বরূপও উন্মোচিত হয়েছিল। পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্ষমতাসীনরা লজ্জাকবলিত হয়েছিলেন। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট 'বাগদাদ চুক্তি'ভুক্ত দেশগুলোর বৈঠকের প্রাক্কালে ক্ষমতাসীন দলের সভাপতির অনশন এবং তাঁর সমর্থনে প্রকাশিত জনমতের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে এ কথাই ঘোষিত হয়েছিল যে, পাকিস্তানের, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জনগণ জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে রয়েছে এবং তারা কোনো যুদ্ধ জোটে থাকতে রাজি নয়।

উল্লেখ্য, অনশন প্রত্যাহার করলেও মওলানা ভাসানী তাঁর আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন। সেই সঙ্গে সর্বাত্মক হয়েছিল ক্ষমতাসীন নেতাদের ভাসানী বিরোধী কার্যক্রমও। পরিণতিতে নিজের প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করে মওলানা ভাসানী গঠন করেছিলেন নতুন দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (২৫ জুলাই, ১৯৫৭)। ন্যাপ নামে বেশি পরিচিত এই দলটি পরবর্তীকালে পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন সরকারের পতন ঘটানোর প্রক্রিয়ায়ও ন্যাপের ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান (১১ অক্টোবর, ১৯৫৭)। (সেকালের ঘটনাপ্রবাহের জন্য দেখুন, শাহ আহমদ রেজার প্রাগুক্ত গ্রন্থ এবং এম রফিক আফজাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-১৫)।

বন্দী অবস্থায় ১১ দিনের অনশন

মওলানা ভাসানী ষষ্ঠবার অনশন করেছিলেন ১৯৬২ সালের ১৯ অক্টোবর। এবার তিনি বন্দী অবস্থায় অনশন করেছিলেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেছিলেন ২৭ অক্টোবর। হোসেন শহীদ সোরাওয়ার্দী ছাড়া পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য সব নেতাকে এ সময় দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়, মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল নিরাপত্তা আইনে। ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর থেকে বন্দী থাকার পর নিজের এবং অন্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, বন্যা দুর্গত জনগণের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ, পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্যদান, ভারত থেকে আগত মুহাজিরদের পুনর্বাসন এবং ক্রুগ মিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বন্যার স্থায়ী সমাধানসহ পাঁচ দফা দাবিতে ১৯৬২ সালের ১৯ অক্টোবর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন মওলানা ভাসানী।

বন্দী ভাসানীর অনশন দেশের সামরিক শাসক আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে প্রচণ্ডতা দেয়, ওদিকে স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ২৭ অক্টোবর। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী ও মাহমুদ আলীসহ প্রাক্তন ক্ষমতাসীন ও তৎকালীন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান নেতারা সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার অঙ্গিকার করে তাঁকে অনশন ভাঙার অনুরোধ জানান। নেতাদের প্রকাশ্য অঙ্গিকার ও অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১১ দিনব্যাপি অনশনের অবসান ঘটান ২৯ অক্টোবর। বিরোধী দলের দাবি ও আন্দোলন এবং জনমতের প্রবল চাপের মুখে আইয়ুব সরকার মওলানা ভাসানীকে মুক্তি দেয় ৩ নভেম্বর। ১৯৫৮ সালের ১২ অক্টোবর থেকে '৬২ সালের ৩ নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় চার বছর একমাস বন্দী থাকার পর প্রধানত অনশনের কারণে সেবার তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে মুক্তি দেয়া হয়েছিল অন্য অনেক রাজনৈতিক বন্দীকেও। (দেখুন, সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত-২, পৃঃ ২৪১; শাহ আহমদ রেজা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪।)

পাকিস্তানের শেষ অনশন

মওলানা ভাসানী তাঁর জীবনের সপ্তম অনশন করেছিলেন ১৯৭০ সালের ৬ আগস্ট। সে বছর পূর্ব বাংলায়– আজকের বাংলাদেশে দু'বার বন্যা হয়েছিল এবং দু'বারই বন্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় জুলাই মাস থেকে বন্যা শুরু হলে বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১ আগস্ট খুলনায় অনুষ্ঠিত ন্যাপ-এর কাউন্সিল অধিবেশনে তিনি অনশনের ঘোষণা দেন এবং ৬ আগস্ট টাঙ্গাইলের একটি জনসভায় ভাষণ দেয়ার পর মাগরিবের নামাজ শেষে সন্তোষে নিজ বাড়িতে অনশন শুরু করেন। জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসার সুবিধা এবং রাজনৈতিক প্রচারণার দৃষ্টিকোণ থেকে ঢাকায় অনশন করার জন্য দলের নেতৃবৃন্দ তাঁকে অনুরোধ জানালেও মওলানা ভাসানী সন্তোষেই অনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, প্রবল বন্যার কারণে সড়ক পথে টাঙ্গাইলের সঙ্গে ঢাকাসহ প্রদেশের অন্য সব এলাকার যোগাযোগ সে সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ব্যাপক প্রচারণা পাওয়ার পাশাপাশি মওলানা ভাসানীর এই অনশন সারা পাকিস্তানে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল। সামরিক শাসনকবলিত দেশের সব রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বিবৃতি ও ব্যক্তিগত তারবার্তার মাধ্যমে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন, উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তাঁর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে।

তিনদিন পর, ১৯৭০ সালের ৮ আগস্ট মাগরিবের নামাজ শেষে মওলানা ভাসানী তাঁর স্ত্রী বেগম আলেমা ভাসানীর হাতে শরবত খেয়ে অনশন ভেঙেছিলেন। এই উপলক্ষে বিশেষ করে ন্যাপ নেতৃবৃন্দ সন্তোষ গিয়েছিলেন, নৌপথে ঢাকা থেকে গিয়েছিলেন সাংবাদিকরা। অনশন ভাঙার পরদিন, ৯ আগস্ট প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশে এক খোলা চিঠিতে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, এই মুহূর্তে বন্যা সমস্যা সমাধানের যথোপযুক্ত ও বাস্তবানুগ ব্যবস্থা না নেয়া হলে বাঙালীরা নিজেদের পথ বেছে নেবে। অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পা বাড়াবে। (অনশনের তিন দিন সম্পর্কে জানার জন্য, সৈয়দ ইরফানুল বারী, 'তিন দিনের অনশনে মওলানা ভাসানীকে যেমন দেখেছি,' প্রাগুক্ত পুস্তিকা 'ভাসানীর অনশন', পৃঃ ১-১০)।

জীবনের শেষ অনশন

মওলানা ভাসানী শেষবার অনশন করেছিলেন ১৯৭৩ সালের ১৫ মে। স্বাধীনতার পর থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সর্বাত্মক ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক দমন-নিপীড়নের পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের যথেচ্ছ লুণ্ঠন, রিলিফের জিনিসসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অনিয়ন্ত্রিত কালোবাজারি এবং বাধাহীন চোরাচালান জনগণকে সর্বস্বান্ত ও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। বিভিন্ন গোপন ও প্রকাশ্য চুক্তি এবং প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও। সে পরিস্থিতিতে প্রথম সফল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন মওলানা ভাসানী। নিজের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ ও কৃষক সমিতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি একযোগে তিনি ভীত ও দুর্বল অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকেও ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ওদিকে মওলানা ভাসানীর প্রতিবাদী আন্দোলন সত্ত্বেও ক্ষমতাসীনদের জনগণের স্বার্থবিরোধী কার্যক্রম ক্রমাগত বাড়ছিল, রাজনৈতিক নির্যাতনও মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিতর্কিত বিজয় লাভের পর সরকারের দমন-নিপীড়ন বেড়েছিল ভয়ংকররূপে।

এই প্রেক্ষাপটে '৭৩ সালের ১৪ মে মওলানা ভাসানী তিন দফা দাবি তুলে ধরেছিলেন : (১) খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করতে হবে; (২) দমননীতি বন্ধ করতে হবে; এবং (৩) শিল্প, ব্যবসা, চাকরি ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে অরাজকতার অবসান এবং জানমালের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

নিজের তিন দফা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে এবং আন্দোলনকে প্রচণ্ডতা দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে মওলানা ভাসানী দাবি উত্থাপনের পরদিন, ১৯৭৩ সালের ১৫ মে থেকে ঢাকায় ন্যাপ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। মওলানা

ভাসানীর বয়স তখন ৮৮ বছর (তাঁর জন্ম ১৮৮৫ সালে বলে অনুমান করা হয়), ফলে অনশনে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং কয়েকজন সাংবাদিকের অনুরোধে তিনি সম্মত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দেশের বিরোধী দলগুলো মওলানা ভাসানীর দাবির সমর্থনে এগিয়ে আসে, ন্যাপ-এর উদ্যোগে আন্দোলন শক্তিশালী হতে থাকে এবং ২২ মে পল্টন ময়দানে জনসভার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মওলানা ভাসানীকে দেখতে হাসপাতালে গেলেও নেতার দাবি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই নীরবতাকে উদ্দেশ্যমূলক নির্লিপ্ততা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ওদিকে মওলানা ভাসানীর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি অব্যাহত থাকে, তাঁর ওজন কমে যায় ২৫ পাউন্ড, দেহের তাপমাত্রা নেমে আসে ৯৬ ডিগ্রিতে এবং ২২ মে সকাল ন'টায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য বুলেটিনে যে কোনো মুহূর্তে তাঁর মৃত্যুর আশংকা প্রকাশ করেছিলেন।

সে পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানীর জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে মিলিতভাবে এগিয়ে এসেছিলেন বিরোধী দলের নেতারা। ন্যাপ নেতাদের সঙ্গে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল–জাসদ, বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, লেলিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দলের প্রধান নেতারা ২২ মে দুপুর সোয়া দুটোয় একযোগে গিয়ে মওলানা ভাসানীকে অনশন ভাঙার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনটি শর্তে তিনি অনশন ভাঙতে রাজি হয়েছিলেন : (১) ন্যাপ আয়োজিত ২২ মে'র জনসভাকে সর্বদলীয় জনসভায় পরিণত করতে হবে এবং সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ এতে ভাষণ দেবেন; (২) সে বছরের (অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের) ২৯ মে থেকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে হবে; এবং (৩) ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

ন্যাপ–এর বাইরে উল্লেখিত ছয় দলের নেতৃবৃন্দ মওলানা ভাসানীর তিনটি শর্তের ব্যাপারে সম্মত হন এবং সেদিনই, '৭৩ সালের ২২ মে এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, 'আমরা মওলানা সাহেবকে গোটা জাতির পক্ষ থেকে অনশন ধর্মঘট ভঙ্গ করার জন্য অনুরোধ জানাই এবং এই প্রতিশ্রুতি তাঁকে প্রদান করি, যে দাবির ভিত্তিতে এবং লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে তিনি অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন, সে দাবি এবং লক্ষ্যকে আদায় করার জন্য আপোসহীন সংগ্রাম করে যাবো। বর্তমান গণবিরোধী ফ্যাসিবাদী শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করার জন্য মেহনতী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবো।... আমরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় মওলানা সাহেবকে উক্ত আন্দোলনের স্বার্থে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। জাতি তাঁর সেবা ও নেতৃত্ব চায়।'

বিরোধী নেতাদের অনুরোধ ও প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের ২২ মে সন্ধ্যায় মওলানা ভাসানী তাঁর আটদিনব্যাপি অনশন ভেঙেছিলেন। উল্লেখ্য, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের গুন্ডা-সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র আক্রমণের কারণে সেদিন বিকেলে পল্টন ময়দানে ন্যাপ-এর জনসভা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর সহযোগিতায় গুন্ডা-সন্ত্রাসীরা জনসভার মঞ্চ ভাঙচুর এবং বিরোধী নেতা-কর্মীদের মারধর করেছিল।

বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলনরত বিরোধী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল মওলানা ভাসানীর আটদিনব্যাপি এই অনশনের এক প্রধান সাফল্য। বিশেষ করে জাসদ সেবারই প্রথম কোনো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল। ঘোষিত প্রতিশ্রুতি থেকে জাসদ সরে গেলেও অন্য দলগুলোর সমন্বয়ে এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পরবর্তীকালে সর্বদলীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। এই ফ্রন্টই ১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে বাকশালের একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রচণ্ড দমন-নির্যাতনের মধ্যেও সরকার বিরোধী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছিল।

দেশে-বিদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের গণবিরোধী ও নির্যাতক চরিত্রের উন্মোচন ঘটানো ছিল মওলানা ভাসানীর অনশনের অন্য এক সাফল্য। '৭৩ সালের ২৩ মে থেকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশীয় শান্তি সম্মেলনের প্রাক্কালে অনশন করায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং সাংবাদিকরা সরকারের চরিত্র ও কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেয়েছিলেন, জানতে পেরেছিলেন এ দেশের জনমত এবং চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কেও। রাজধানীর মতিঝিলে হোটেল 'পূর্বানী'র সামনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত 'ভিয়েতনাম দ্বীপ' বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা ২১ মে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলেও আওয়ামী লীগ সরকার এবং তার দুই সমর্থক দল মোজাফফর ন্যাপ ও মনি সিংহের মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির জনসমর্থনহীনতার বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল।

মওলানা ভাসানীর এই অনশন একই সঙ্গে বিশেষ করে ভারতীয় আধিপত্যবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধেও ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। অনশনকেন্দ্রিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালের ২৯ মে'র সেই দিনটিতেই ন্যাপ-এর আহবানে সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়েছিল, যেদিন বিভিন্ন প্রকাশ্য চুক্তি নবায়নের উদ্দেশ্যে ঢাকায় এসেছিলেন ভারতের পরিকল্পনামন্ত্রী ডি পি ধর। চুক্তির নবায়ন প্রতিহত না করতে পারলেও সেদিনের হরতাল ভারত বিরোধী জনমতের সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছিল। (ওপরের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানতে দেখুন : মওলানা ভাসানীর তিন দফার জন্য আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা, '২১ দফা থেকে ৫ দফা', ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ২৫১; বিরোধী

নেতাদের অঙ্গিকার ও বিবৃতির জন্য অলি আহাদ, 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫', পৃ. ৫৫০-৫৫৪; সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য শাহ আহমদ রেজার নিবন্ধ 'তেয়াত্তরে মওলানা ভাসানীর অনশন ব্যর্থ হয়নি', প্রাগুক্ত পুস্তিকা 'ভাসানীর অনশন', ১৯৭৪, পৃ. ২৭-৩৪)।

দেশ ও জনগণের জন্য সংগ্রাম

১৯৩২ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ওপরে উল্লেখিত আটটি অনশন এবং সেকালের রাজনীতি ও অনশনকেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহের মূল্যায়নকালে বলা যায়, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রতিটি উদ্যোগই ছিল সর্বতোভাবে দেশ ও জনগণের কল্যাণের জন্য। প্রথাগত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার এবং ক্ষমতাসীনদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছেন দ্বিধাহীনভাবে। কয়েক লাখ মানুষের মিছিল-সমাবেশের চাইতেও প্রভাবশালী ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে মওলানা ভাসানীর একার অনশন এবং দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর দাবি আদায় হয়েছে অনতিবিলম্বে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সুফল অর্জিত না হলেও প্রতিটি অনশনই সুদূরপ্রসারী এবং ইতিবাচক অবদান রেখেছে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বীকৃত পন্থা ও কৌশল এই অনশনের প্রয়োগ করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। গৌরিপুরের অত্যাচারী ও প্রবল ক্ষমতাধর মহারাজার বিরুদ্ধে তাঁর অনশন ছিল এক দুর্দান্ত সাহসী পদক্ষেপ। মহারাজার এলাকায় মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাধারণভাবে ধর্ম নির্বিশেষে কৃষক-প্রজার ওপর নির্যাতনের ব্যাপক অবসান ঘটানো ছিল সে অনশনের অনন্য সাফল্য। 'লাইন প্রথা' ও 'বাঙ্গাল খেদা'-এর বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর অনশন ও আন্দোলন আসামে বাঙালীদের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সে অধিকারের ভিত্তিতে এখনও আসামে বসবাস করছে কয়েক লাখ বাঙালী পরিবার। নিজের নেতৃত্বাধীন দলের শাসনকালে অনশন করার মধ্য দিয়েও মওলানা ভাসানী তাঁর রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকটিকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। দেশ ও জনগণের কল্যাণের স্বার্থে তাঁর এই সংগ্রাম অব্যাহত ছিল জীবনের শেষ দিনগুলোতেও। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর ইন্তেকালের মাত্র ছয় মাস আগে, ১৬ মে তিনি ফারাক্কা মিছিলের আয়োজন করেছিলেন। ঐতিহাসিক সে মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণ।

* সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৭

মওলানা ভাসানীর সঙ্গে ঢাকা সফর

গত ১৭ নভেম্বর ছিল বাংলাদেশের জাতীয় নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ২৫তম ইন্তেকাল বার্ষিকী। এই উপলক্ষে নিয়মিত ধারার বাইরে গিয়ে আজ একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা জানাতে চাই। ছাত্র জীবনে মওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যে যাওয়ার এবং তাঁর জন্য কিছু কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। অনানুষ্ঠাকিভাবে আমার সাংবাদিকতার শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালের মার্চে, মহান নেতার সাপ্তাহিক 'হক-কথা'র মাধ্যমে। তখন আমি 'আহমদ শাহ রেজা' নামে লিখতাম। 'হক-কথা' ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী প্রধান সংবাদপত্র– যা সেই সময়ে টাঙ্গাইল, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা থেকে একযোগে প্রকাশিত হতো। এর জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে সরকার 'হক-কথা'কে ১৯৭২ সালেই নিষিদ্ধ করেছিল। মওলানা ভাসানীর সান্নিধ্যেও গিয়েছিলাম 'হক-কথা'কে কেন্দ্র করে। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি আমাকে সন্তোষে গিয়ে বসবাস করতে বলেন। রক্ষীবাহিনী তাড়িয়ে ফিরছিল বলে নিরাপত্তার জন্য আমিও সন্তোষে চলে যাই এবং সে বছরের জুন মাসে তাঁকে গৃহবন্দী করার কয়েকদিন পর পর্যন্ত সেখানে থাকি। নিচে বর্ণিত অভিজ্ঞতা ওই সময়ের। এ থেকে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে দেশের অবস্থা এবং মওলানা ভাসানীর সংগ্রাম সম্পর্কে শুধু নয়, ব্যক্তি ভাসানী সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

॥ এক ॥

১৯৭৪ সালের এপ্রিল। ক্রমাগত ঝড় আর শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে গেছে। সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের আশংকায় মওলানা ভাসানী তখন ভীষণ অস্থির। গ্রামে গ্রামে কাজের বিনিময়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করার এবং সর্বদলীয় ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষ মোকাবিলার পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি পত্রিকায় বিবৃতি দিলেন, তারবার্তা পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। এরপর তিনি ১৪ এপ্রিল জনসভা ডাকলেন পল্টন ময়দানে। একটি ব্যতিক্রমও ঘটলো। জনসভাটি তিনি তার নতুন সংগঠন 'হুকুমতে রব্বানীয়া সমিতি'র নামে ডাকলেন, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি– ন্যাপকে এড়িয়ে গেলেন। এর কারণ, ন্যাপের অভ্যন্তরে তখন

কোন্দল তুঙ্গে। কাজী জাফর আহমদ এবং রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে ভাসানীপন্থী সর্বশেষ বাম গ্রুপটি স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে ন্যাপের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করেছিলেন। কাজী জাফর হয়েছিলেন সাধারণ সম্পাদক, রাশেদ খান মেনন ছিলেন প্রচার সম্পাদক। আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতার কারণে বন্দী মশিউর রহমান যাদু মিয়া জেল থেকে বেরিয়ে এসেই সে কমিটির বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে পড়েন। ফলে বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে বিবদমান দুটি পক্ষ মুখোমুখি অবস্থানে এসে যায় এবং দলের ভাঙন এড়ানোর উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানী কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল ঘোষণা করেন। তাই জনসভার এ সময়টিতে ন্যাপের কোনো কার্যনির্বাহী কমিটি ছিল না, ছিল একটি আহবায়ক কমিটি।

কলেজের ছাত্র হলেও আমি তখন মওলানা ভাসানীর প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্বে। সপ্তাহিক 'হক-কথা' নিষিদ্ধ হওয়ার (১৯৭২) পর থেকে বিভিন্ন নামে তিনি পত্রিকা ও বুলেটিন প্রকাশ করে আসছিলেন। আইনগত কারণে কোনো একটি বিশেষ নামেই তিন সংখ্যার বেশি পত্রিকা বা বুলেটিন বের করা হতো না। যেমন 'জেহাদ' নামে তিন বার প্রকাশিত হওয়ার পর নতুনটির নাম দেয়া হয়েছিল 'ভাসানীর জেহাদ'। ১৪ এপ্রিলের জনসভা উপলক্ষেও অমন একটি পত্রিকা ছাপানোর কাজ চলছিল। এবারের নাম 'ভাসানীর টেলিগ্রাম'। 'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারীকে মওলানা ভাসানী হুকুমতে রব্বানীয়া সমিতির সাধারণ সম্পাদক বানিয়েছিলেন। জনসভার জন্য তিনি আগেই ঢাকা চলে গেছেন। ফলে 'শান্তি প্রেস'–এর একটি মাত্র ট্রেডল মেশিনে বিশ হাজার কপি পত্রিকা ছাপাতে গিয়ে আমার অবস্থা তখন উপভোগ করার মতো। তার ওপর দু'দিন ধরে অবিরাম ঝড় আর বৃষ্টি চলছে, বিদ্যুতও যাচ্ছে বারবার।

সে অবস্থায়ও আগের দিন, ১৩ এপ্রিল বিকেলে মওলানা ভাসানী আমাকে ডেকে পাঠালেন, হাতে তুলে দিলেন নতুন একটি প্রচারপত্রের খসড়া। টাঙ্গাইলের ন্যাপ নেতা মোহাম্মদ আলীকে দিয়ে তিনি দুপুরেই ওটা লিখিয়ে রেখেছেন, সংশোধন করে অন্তত পাঁচ হাজার কপি ছাপাতে বললেন। অক্ষমতার কথা জানানোর পর তিনি শুধু টাঙ্গাইলে প্রচারের জন্য এক-দেড় হাজার কপি ছাপানোর নির্দেশ দিলেন। ঢাকার দৈনিকগুলোর জন্য বললেন হাতে লিখতে, পরদিন সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

॥ দুই ॥

১৪ এপ্রিল সকালে বিবৃতিটি লিখে দেখালাম, তিনি স্বাক্ষর দিলেন 'মোঃ আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানী'। স্বাক্ষরে তিনি 'খাঁ' লিখতেন, 'খান' নয় এবং 'ভাসানী'

বসাতেন নিচের বা দ্বিতীয় লাইনে। সাড়ে ২৭ বছর পরও তাঁর সে স্বাক্ষর সম্বলিত বিবৃতিটি এখন আমার সামনে, সেই সাথে আছে মুদ্রিত প্রচারপত্রের কপি আর ১৭ এপ্রিল সংখ্যা দৈনিক 'জনপদ'-এর কাটিংটুকু। এতে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন : '...এবার যে সামান্য পরিমাণ চিনা, কাউন ও তিলের ফলন হইয়াছিল গত কয়েকদিনের ভয়াবহ ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে তাহার সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বাঁশ ও কাঠের অভাবে মানুষ বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির খুঁটি লাগাইতে না পারিয়া মুক্ত আকাশের নিচে বাস করিতেছে।...

'...গ্রামের কৃষক, মজুর, কামার, কুমার, জেলে, মাঝি, তাঁতী, সুতার প্রভৃতি শ্রেণীর যে গরীব মানুষেরা দীর্ঘদিন যাবৎ কেবল আটার ফেন খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছিল, তাহাদের শেষ ভরসা আম ও কাঁঠাল গাছ এবং কলার বাগানও ঝড়ে পড়িয়া যাওয়ায় অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যুর আশংকায় তাহারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।...ফলে চতুর্দিকে হাহাকার উঠিয়াছে, প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা হইতে অসংখ্য শিশু ও বৃদ্ধের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আসিতেছে।...'

খয়রাতি সাহায্য এবং টেস্ট রিলিফের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের কঠোর সমালোচনা করে মওলানা ভাসানী এরপর বলেন : '...৭ দিন অনাহারে থাকিয়া মরা গরু খাইলে যেমন কোন পাপ হয় না, তেমনি লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচিবার জন্যে গুটিকয়েক মুনাফাখোর সমাজ বিরোধীর সম্পদ লুণ্ঠন করিলেও তাহাতে কোন অন্যায় হইতে পারে না।...'

বিবৃতির শেষাংশে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেছিলেন, 'সরকারি শোষণ নীতির বিরুদ্ধে এবং খাদ্যের দাবিতে' তিনি ২৯ এপ্রিল থেকে আমরণ অনশন শুরু করবেন। সবশেষে তিনি বলেন : '...সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি আমার আবেদন, আপনারা শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি লউন। আমি অনশন শুরু করিলে ২৯শে এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্যন্ত তিনদিন সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ হরতাল করিয়া শোষকগোষ্ঠীর সহিত বাঁচা-মরার প্রশ্নে চূড়ান্ত বোঝাপড়া সম্পন্ন করুন।'

ওদিকে মওলানা ভাসানীকে ঢাকা নেয়ার জন্য গাড়ি এসেছিল এগারোটার দিকে। তার অগেই পত্রিকা ছাপানোর কাজ শেষ হয়েছিল অনেক কষ্টে। বিশ হাজার কপি গাড়িতে ওঠানো হলো। মওলানা ভাসানী বসলেন সামনের সিটে, ঢাকা থেকে আগত রব্বানীয়া সমিতির কর্মীর সঙ্গে আমি বসলাম পেছনে। পথে মীর্জাপুর পেরিয়ে আসার পর দেওহাঁটার কাছাকাছি একদল ছাত্র গাড়ির পথ রোধ করল– তাদের নাটকের জন্য চাঁদা দিতে হবে। আমার ইশারা সত্ত্বেও তারা মওলানা ভাসানীকে চিনতে পারেনি, তাদের দাবির সুর খুব জোরালো হতে শুরু করলে দেখলাম মওলানা ভাসানী তাঁর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে কিছু ভাংতি পয়সা বের

করে একজনের হাতে দিলেন। হাসির রোল উঠলো– ভাংতি পয়সার আবার নাটকের চাঁদা হয় নাকি! কিন্তু মুহূর্তে হাসি থেমে গেলো, কটু কিছু বলার জন্য জানালায় মুখে আনতেই ছাত্রদের একজন মওলানা ভাসানীকে চিনে ফেললো। দেখলাম তার জিভে কামড় পড়ে গেছে। পয়সা ফেরত এলো, মাফ চাওয়ার পর তারা 'মওলানা ভাসানী জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিল। কিন্তু গাড়ি ছাড়তেই ভেসে এলো আর এক স্লোগান : 'জয় বাংলা'!

॥ তিন ॥

১৯৭৪ সালের ১৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত পল্টন ময়দানের সে জনসভার কথা আমার মনে থাকবে অন্তত একটি কারণে। আসলে ন্যাপ বা হুকুমতে রব্বানীয়া সমিতির মতো দল ও সংগঠন কোন বিষয় ছিল না, মানুষের ঢল নামতো মওলানা ভাসানীর নামে। তিনি নিজেই ছিলেন এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। সেদিন মঞ্চে কোনো পরিচিত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, সংগঠিত কোনো মিছিলও আসেনি কোনো প্ল্যাকার্ড বা ব্যানার নিয়ে। পল্টন ময়দান তথাপি জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। আমার দায়িত্ব ছিল সঙ্গে আনা 'ভাসানীর টেলিগ্রাম' বিক্রির ব্যবস্থা করা। যে যুবক-কর্মীরা সেদিন পঁচিশ পয়সার সে পত্রিকাটি ফেরি করে বিক্রি করেছিলেন, তাদের কাউকেই আগে চিনতাম না। স্টেডিয়ামের বারান্দায় আমি অবস্থান নিয়েছিলাম, ওরা প্রতি মিনিট ছুটে আসছিলেন এবং আগের টাকা জমা দিয়ে নিচ্ছিলেন পঞ্চাশ কিংবা একশ' করে নতুন পত্রিকা। অবিশ্বাস্য মনে হবে শুনলে– কিন্তু বিশ হাজার কপি 'ভাসানীর টেলিগ্রাম' সেদিন ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। তখনও চাহিদা ছিল, ফলে সেখান থেকে সরে পড়া ছাড়া আমি উপায় দেখিনি।

মওলানা ভাসানী তখন আওয়ামী লীগ সরকারের কঠোর সমালোচনা করে চলেছেন : 'আমরা সীমান্তে চোরাচালানের কথা বললে ভারতের সাথে বন্ধুত্ব নস্যাতের অভিযোগ আনা হতো, এখন তাহলে মিলিটারি মোতায়েন করা হয় কেন? সরকার নিজেই আজ চোরাচালানের কথা স্বীকার করে, এতে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় না?... ধান, চাল, পাটসহ যা যাবার তা আগেই পাচার হয়ে গেছে, আর তাই বৈশাখ মাসে মিলিটারি মোতায়েন করে কোনো লাভ হবে না। তাছাড়া এ মাসেই পুরোদমে নদীতে নৌকা চলাচল শুরু হবে এবং তখন মিলিটারি কেন, ফেরেশতা মোতায়েন করলেও চোরাচালান ঠেকানো যাবে না।...'

সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সর্বদলীয় ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশে মওলানা ভাসানী আরো বলেছিলেন, 'আবেদন-নিবেদনে তিন বছর সময় দিয়েছি, আর নয়। আইয়ুব-

ইয়াহিয়া বিরোধী আন্দোলনের মতো আবারও আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।...' ২৯ এপ্রিল থেকে এই আন্দোলনে অংশ নেয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানালেন, আমরণ অনশনের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করলেন।

॥ চার ॥

সভাশেষে মশিউর রহমানসহ ন্যাপ নেতাদের নিরাশ করে তিনি গিয়ে উঠলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. মীর ফখরুজ্জামানের বাসায়, শহীদবাগে। ড. ফখরুজ্জামান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক, রাজনৈতিক কারণে সে সময় তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল। মওলানা ভাসানী তাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছিলেন সম্ভবত ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে (১৯৭৪)। আমার জানা মতে, এজন্য তিনি কোনো বেতন পেতেন না, সম্মানী হিসেবে সামান্য টাকা তাকে দেয়া হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এই সময়কালে কাউকেই আনুষ্ঠানিকভাবে বেতন দেয়ার মতো অবস্থা মওলানা ভাসানীর ছিল না। খুব গরিব দু'চারজন ছাড়া সকলেই কাজ করতেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে– কোনো বেতন ছাড়া। সরকার বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তখনও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে কোনো অর্থ সাহায্য দেয়নি, খরচের সম্পূর্ণ অর্থই আসতো মওলানা ভাসানীর মুরিদ এবং ভক্তদের সাহায্য থেকে। এটা পৃথক প্রসঙ্গ, কিন্তু সেদিনটির কথা এই সাথে না বলে পারা যায় না– যেদিন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতে খরচ করার জন্য ড. মীর ফখরুজ্জামানকে মওলানা ভাসানী প্রথমবারের মতো টাকা দিয়েছিলেন। তারিখটি ছিলো ১৯৭৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। সন্তোষ দীঘির পশ্চিম পাড়ে 'মুসাফিরখানার' সামনে মওলানা ভাসানী তার হাতে মাত্র চারটি একশ' টাকার নোট তুলে দিয়ে 'খুব বুঝে শুনে' খরচ করতে বলেছিলেন। পরিষ্কার মনে আছে, চারটির মধ্যেও একটি নোট আবার ছেঁড়া ছিল, মওলানার মুখে তখন লজ্জা পাওয়ার মতো হাসি। এ সময় মরহুম অধ্যাপক শাহেদ আলী এবং নাট্যকার অধ্যাপক আসকার ইবনে শাইখও উপস্থিত ছিলেন।

ন্যাপের অভ্যন্তরে সংঘাতের কথা আগেই বলেছি। সে কারণে মওলানা ভাসানী এবার কোনো ন্যাপ নেতার বাসায় ওঠেননি। কিন্তু ন্যাপ নেতারা আসছিলেন দলে দলে, সবাই উদ্বিগ্ন অনশনের সিদ্ধান্তে। কারণ, মওলানা ভাসানীকে তারা বোঝালেন, কমিটিবিহীন অবস্থায় ন্যাপ কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না। তাই অনশনের প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। মশিউর রহমান এবং কাজী জাফরের নেতৃত্বাধীন উভয় গ্রুপই অবিলম্বে ন্যাপের কেন্দ্রীয়

কমিটি গঠনের সুপারিশ করলেন, তবে পৃথক পৃথকভাবে। মওলানা ভাসানী শুধু শুনে গেলেন, অপেক্ষা করতে বললেন এবং পরদিন সকালে ন্যাপ অফিসে যাবেন জানিয়ে বিদায় করলেন সকলকে।

সবাই বিদায় নেয়ার পর শোয়ার ব্যবস্থা হলো। ড. ফখরুজ্জামান তার ঘরটি ছেড়ে দিলেন মওলানা ভাসানীর জন্য। ভাসানীভক্ত এক যুবক ডাক্তারও থাকলেন সে ঘরটিতে, দরোজার সামনে মেঝেতে তার বিছানা পাতা হলো। আমার কাছ থেকে পত্রিকা বিক্রির সংবাদ জানলেন মওলানা, খুশি হলেন। পরদিন সকালেই সন্তোষ ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত জানালেন তিনি। ড. ফখরুজ্জামানের হাসি-খুশি স্ত্রীকে বললেন খুব ভোরে নাশতার আয়োজন করতে। দু'জন বৃটিশ সাংবাদিক আসবেন তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে, তাদের জন্যও খাবার রাখতে বললেন। আমি ওপরে খোলা ছাদে চলে গেলাম শোয়ার জন্য।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন, ১৫ এপ্রিল সকালে ঘুম ভাঙলো খুব গোলমালের শব্দে। মওলানা ভাসানীকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাসার প্রত্যেকেই ছুটছেন ব্যস্তভাবে। একে অন্যকে জিজ্ঞেস করছেন তাঁর সম্পর্কে। সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন বেচারা যুবক ডাক্তার : তিনি ঘুমিয়েছেন ঘরের দরোজার ঠিক সামনে, তার অন্তত জানা উচিত– কখন কিভাবে মওলানা বেরিয়েছেন ঘর থেকে। তিনিও কিছুই জানেন না। সন্ত্রস্ত ড. ফখরুজ্জামান এক ফাঁকে জানালাগুলোতেও চোখ বুলিয়ে নিলেন। বিপজ্জনক কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা তার চোখে। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম, মওলানা ভাসানীর প্রাত্যহিক জীবনধারা সম্পর্কিত ধারণা থেকে আশপাশের মসজিদগুলোতে খোঁজ করার কথা বললাম। কথাটা সবার পছন্দ হলো, বেশ ক'জন ছুটলেন সাথে সাথে। আমি তখন দেখছিলাম বাসার ঘরগুলো– যেভাবেই মওলানা গিয়ে থাকুন, তাঁকে পেরোতে হয়েছে দুটি ঘর, খুলতে হয়েছে দুটি দরোজা আর প্রতিটিতেই ছিলেন ড. ফখরুজ্জামানের পরিবারের সদস্যরা। ড্রয়িং রুমে ক'জন ভাসানীভক্তও ছিলেন। তাদের কেউই টের পাননি, কখন তিনি বেরিয়ে গেছেন।

একটু পরই সংবাদ এলো, শহীদবাগের একটি মসজিদে মওলানা ভাসানী ফজরের নামাজ পড়েছেন, নামাজ শেষে আলাপ করেছেন মুসল্লিদের সঙ্গে। তারপর তিনি কোথায় যে গেছেন, তা ইমাম সাহেব বলতে পারেননি। ফলে আবার উদ্বেগের পালা শুরু হলো, কাছাকাছি কার বাসায় তিনি যেতে পারেন প্রশ্নটি আলোচনায় এলো। কিন্তু মীমাংসা সম্ভব হলো না, উপস্থিত কেউই তেমন কাউকে চেনেন না, জানালেন। তবু সবাই বেরিয়ে পড়লেন, কারো না কারো কাছে জানা

যাবেই। কারণ, হারিয়ে যাওয়া মানুষটি মওলানা ভাসানী।

দেখতে দেখতে সকাল আটটাও পেরিয়ে গেলো। রাশেদ খান মেননসহ ন্যাপ নেতাদের অনেকে এসে গেলেন, এলেন বিদেশী সাংবাদিক দু'জনও। তারা অবাক হলেন শুনে, মওলানা ভাসানীর মতো নেতাও এমনভাবে নিখোঁজ হতে পারেন! কিন্তু বিশ্বাস করতেই হলো, সাংবাদিক দু'জনও বের হলেন মওলানাকে খুঁজতে। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার সুযোগ তারা হারাতে চান না।

আমি কিন্তু খুঁজতে যাইনি কোথাও। উদ্বেগ ছিল মনে, সেই সাথে ছিল বিশ্বাসও– মওলানা ভাসানী হারিয়ে যাবেন না, রাজনৈতিক কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কাও আমাকে নাড়া দেয়নি। এর কারণ, মওলানা ভাসানীর নিরাপত্তার বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকার বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতো– যদিও নিজেদের স্বার্থে। আমি তাই একটি ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম, মওলানা ভাসানী যেখানেই থাকুন নিরাপদেই আছেন।

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। মওলানা ভাসানীকে খোঁজার জন্য নয়, নাশতা খেতে। রাজারবাগ পুলিশ সদর দফতরের প্রধান গেটের উল্টোদিকে শহীদবাগে প্রবেশের রাস্তার মাথায় তখন একটি ছোট রেস্তোরাঁ ছিল, সেখানে খেতে গেলাম। খেতে খেতেই 'মওলানা ভাসানী' নামটি শুনলাম কয়েকবার, রেস্তোরাঁর সবাই আলাপে আলাপে বলছিল তার কথা। জিজ্ঞেস করতেই একজন পুলিশ সদর দফতরের দিকে আঙুল তুলল, দেখলাম প্রবেশ পথের পাশে অবস্থিত মাজারে অনেক মানুষের ভিড়। গিয়ে দেখি মাজারের বাঁধানো সিঁড়িতে বসে মওলানা কথা বলছেন, শ্রোতাদের অধিকাংশই পুলিশের লোক। আলোচনার বিষয় শুনলাম ঘুষ এবং দুর্নীতি– পুলিশের সদর দফতরের মাজার প্রাঙ্গণে বসে মওলানা ভাসানী পুলিশদের উপদেশ দিচ্ছেন ঘুষ না খাওয়ার জন্য! বলছেন, পুলিশই এদেশে সবচেয়ে বেশি 'ঘুষখোর' হিসেবে নিন্দিত। ভিড় তখনও বাড়ছিল, আগত প্রত্যেকে গিয়ে সালাম করছিল মওলানাকে।

আমাকে দেখেই মওলানা ভাসানী নড়েচড়ে বসলেন, বুঝলেন আমাদের উদ্বেগের কথা। আরো কিছুক্ষণ আলোচনার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, জানতে চইলেন বিদেশী সাংবাদিক দু'জন এসেছেন কি না। পুলিশ কর্মকর্তারা গাড়ি আনতে চাইলেন, মওলানা ভাসানী না করলেন। আমরা বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় আসতেই দেখি উভয় দিক থেকে ছুটে আসছেন সন্ধানকারীরা, তাদের মধ্যে ছিলেন বিদেশী সাংবাদিক দু'জনও।

ড. মীর ফখরুজ্জামানের বাসায় ফিরে জানা গেল, মওলানা ভাসানীর সকালের খাওয়া হয়ে গেছে রাজারবাগ মাজারে। তিনি আমাদের কথা জানতে চাইলেন,

খাওয়াতে বললেন সাংবাদিক দু'জনকে। বিস্ময়ে অভিভূত সাংবাদিকরা মওলানার সাক্ষাৎকার নিলেন, দোভাষীর দায়িত্ব পালন করলেন রাশেদ খান মেনন। মওলানা ভাসানী ইংরেজি পুরোপুরি বলতে না পারলেও বুঝতেন অন্যের কথা। ফলে তাকে প্রশ্ন বোঝাতে হতো না, অনুবাদ করতে হতো শুধু তাঁর নিজের বক্তব্যটুকু। তাঁর কথায়ও থাকতো অনেক ইংরেজি শব্দ।

॥ ছয় ॥

সেদিন সন্তোষের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়তে বেলা প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল। গাড়িতে সামনে মওলানা ভাসানী, পেছনের সীটে ছিলাম আমি আর ইরফানুল বারী। ফার্মগেটে মওলানা গাড়ি থামাতে বললেন, 'বাবুর মা', বেগম আলেমা ভাসানীর জন্য পানের জর্দা কিনতে হবে (আবু নাসের খান ভাসানী মওলানা ভাসানীর বড় ছেলে। মওলানা তাকে 'বাবু' বলে ডাকতেন)। গাড়ি থামাতেই ভিড় জমতে লাগলো। কে একজন দরোজা খুলে সালাম করলেন, 'সালামী'ও দিলেন 'হুজুর'-কে। দরোজা খোলাই রইল শেষ পর্যন্ত, সালাম আর সালামীর পালা চলল অনেকক্ষণ। জর্দা এসে গেল কয়েক ডিবে, এলো ফলফলারিও। বিশেষ করে এত বেশি তরমুজ এসেছিল যে, নেয়ার মত জায়গা ছিল না গাড়িতে। এখানেও মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বললেন, জানালেন তাঁর অনশনের সিদ্ধান্ত। মানুষের ভিড়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ হওয়ার অবস্থা হতেই মওলানা ভাসানী গাড়ি ছাড়তে বললেন। না হলে আর একটু পর তাঁকে সেদিন সেখানেই জনসভায় ভাষণ দিতে হতো।

উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ, দৈনিক ইনকিলাব, ১৯.১১.২০০১

মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের সম্পর্ক

মাঝে-মধ্যে ইতিহাস স্মরণ করা ও করিয়ে দেয়া দরকার হয়ে পড়ে। সঠিক ইতিহাস জানানোর জন্য শুধু নয়, অসত্য তথ্য সংশোধন করার এবং অনেকের স্বার্থচিন্তাপ্রসূত ভুল ব্যাখ্যা ধরিয়ে দেয়ার জন্যও পেছনে ফিরে যেতে হয়। বর্তমান পর্যায়ে এর কারণ সৃষ্টি করেছেন লন্ডনে বসবাসরত বুদ্ধিজীবী নামধারী সেই আওয়ামী 'মোড়ল'- ইতিহাস বর্ণনার নামে গল্প ফেঁদে বসার ব্যাপারে মরহুম এম আর আখতার মুকুল যার যোগ্য তুলনা। নিজের মতো করে গল্প ফাঁদেন এবং সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে ব্যাখ্যা হাজির করেন বলে এই আওয়ামী 'মোড়ল'-এর কোনো লেখাই আমাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। ইতিহাসের ছাত্র এবং তার বর্ণিত অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমি বরং বিরক্ত হই। অমাকে সেই সাথে উদ্বিগ্নও হতে হয়। কারণ, সঠিক ইতিহাস যাদের জানা নেই, তারা বিভ্রান্ত হতে পারেন এবং গালগল্পকেই সত্য বলে ধরে নিতে পারেন। এজন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও কম্পিউটারের সামনে বসতে হয়েছে, লিখতে বাধ্য হয়েছি।

প্রথমে উপলক্ষ বা কারণ সম্পর্কে জানিয়ে নেয়া দরকার। কিছুদিন ধরে এই আওয়ামী 'মোড়ল' ঢাকার একটি দৈনিকে বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানোর নামে রীতিমতো প্যাঁচাল শুরু করেছেন। মনে করা হয়েছিল, বড়জোর দু-এক কিস্তির মধ্যেই তিনি বোধ হয় থেমে যাবেন। কিন্তু তার প্যাঁচাল এখনো থামেনি। প্রতিবার তিনি শুধু দুঃখই প্রকাশ করে চলেছেন। সর্বশেষ কিস্তিতে অবারও আশ্বস্ত করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, আগামী কিস্তিতেই তার এই প্যাঁচালের সমাপ্তি ঘটবে। তার এবারের কথা সত্য হলে আজই (১৮ এপ্রিল, ২০০৫) পাঠকদের নিস্তার পাওয়ার কথা। আমার অবশ্য বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার ঐক্যকেন্দ্রিক এই প্যাঁচালের সমাপ্তির ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। 'হাতি-ঘোড়া গেলো তল' সংক্রান্ত প্রবাদবাক্য মনে পড়ে গেছে বলে বিষয়বস্তু হিসেবেও দুই নেত্রীর ঐক্য আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও লিখতে হচ্ছে। কারণ, ইতিহাস উল্লেখের নামে অওয়ামী 'মোড়ল' নতুন পর্যায়েও অসত্যের আশ্রয় নিয়েছেন এবং নিজের ইচ্ছামতো তথ্য ও ব্যাখ্যা হাজির করেছেন।

আপত্তির প্রধান কারণ ঘটিয়েছেন তিনি ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিতে গিয়ে।

বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার জন্য তিনি মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে টেনে এনেছেন। আপত্তির কারণ শুধু এটুকুই নয়। আওয়ামী 'মোড়ল' তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিব নাকি পরস্পরের 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ' ছিলেন, খালেদা-হাসিনার মতো 'রাজনৈতিক শত্রু' ছিলেন না। এ পর্যন্ত এসে থেমে গেলেও হয়তো আপত্তি জানানোর জন্য বেশি কষ্ট করতে হতো না। কিন্তু আফটার অল, আওয়ামী 'মোড়ল' তিনি– এত অল্প কথায় থেমে যাওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। তিনি তাই প্রথমে পিছিয়ে গেছেন এবং তারপর কয়েক ধাপ এগিয়ে এসে বলে বসেছেন, তিনিই সে তিনি, যিনি তার সম্পাদিত এক সান্ধ্য দৈনিকে নাকি 'ভাসানী-মুজিব ঐক্য চাই' শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। কেন লিখেছিলেন, তার কারণও জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, 'আইয়ুব-মোনেমের স্বৈরশাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সফল হতে হলে পূর্ব পাকিস্তানে ভাসানী-মুজিব ঐক্য চাই'। এই সম্পাদকীয় দেখে বন্দী নেতা শেখ মুজিব নাকি তাকে বলেছিলেন, '...তোমাকে ভাসানী-মুজিব ঐক্যের জন্য স্লোগান দিতে হবে না। আমি সবার চেয়ে মওলানা সাহেবকে ভাল চিনি। আমার জন্য তার মনে গভীর দরদ। সময় হলে আমি ডাক দিলেই তিনি চলে আসবেন।...'

নিবন্ধের এই পর্যায়ে এসে আওয়ামী 'মোড়ল' জানিয়েছেন, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শেষদিকে এসে বুঝলাম, ভাসানী-মুজিব ঐক্যের দাবিতে আর কিছু লেখার দরকার নেই। দুই নেতার মধ্যে একটি গোপন সমঝোতা হয়ে গেছে।...' এখানেও শেষ নয়, এ পর্যন্ত আসার পর আওয়ামী 'মোড়ল' তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান নাকি ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাবিরোধী গণঅভ্যুত্থান' এবং ভাসানী-মুজিবের 'গোপন যোগাযোগ ও সমঝোতার ফল'! ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহের বিভিন্ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের প্রতি মওলানা ভাসানীর 'সমর্থন'ও আবিষ্কার করেছেন তিনি। বলেছেন, আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর অনুসৃত নীতি নাকি ছিল 'রীতিমতো মাস্টার স্ট্রোক'!

ওপরে অতিসংক্ষেপে উল্লেখিত তথ্যগুলো থেকে যে কারো ধারণা হবে যেন শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করা এবং আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করানোই ছিল ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের একমাত্র উদ্দেশ্য! শুধু তা-ই নয়, আওয়ামী 'মোড়ল'-এর ভাষায় 'প্রায় দা-কুমড়োর মতো' সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মওলানা ভাসানী তাঁর 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ' শেখ মুজিবকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য নিয়ে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেছিলেন, একে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

আপত্তির কারণ উঠেছে আসলে একাধিক কারণে। প্রথম কারণ হলো, নিজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দেয়ার পেছনেও মওলানা ভাসানীর বিপুল অবদান ছিল। পাকিস্তান আমলে তো বটেই, জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্তও দু'জনের সম্পর্ক ছিল ঠিক পিতা ও পুত্রের মতো। এই সম্পর্ক কোনো 'মিয়া'-ই নষ্ট করতে পারেননি। পরবর্তীকালে 'মোড়ল' হিসেবে পরিচিত চরম সুবিধাবাদী ও সকল দিক থেকে সুবিধাভোগকারীরাও বিভিন্ন সময়ে ষড়যন্ত্রের পথে প্রচেষ্টা চালিয়ে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। নীতি-কর্মসূচি, দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলের ব্যাপারে যথেষ্ট মতপার্থক্য থাকলেও তাই এমন মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের সম্পর্ক ছিল 'প্রায় দা-কুমড়োর মতো' কিংবা দু'জন পরস্পরের **'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ'** ছিলেন।

আপত্তির দ্বিতীয় কারণ হিসেবে এসেছে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত মন্তব্য। এখানেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গ টেনে আনতে হয়। আওয়ামী 'মোড়ল' বলেই তিনি সবকিছুর মধ্যে শুধু নিজেদের নেতা শেখ মুজিবকে দেখেছেন, ছাত্র-জনতার আশা-আকাংক্ষার প্রতি সামান্য সম্মান পর্যন্ত দেখাননি। তিনি সেই সাথে বলতে চেয়েছেন, যেন ওই অভ্যুত্থানের পেছনে শেখ মুজিব শুধু নন, তার ঘোষিত ৬ দফাও প্রধান ভূমিকা রেখেছিল! যেন আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো দলই ছিল না সেখানে! অন্যদিকে তথ্যানিষ্ঠ ইতিহাস কিন্তু সেকথা বলে না। কারণ, ৬ দফা উপস্থাপনার এবং এর ভিত্তিতে আন্দোলন প্রচেষ্টার প্রাথমিক পর্যায়ে, ১৯৬৬ সালের ৯ মে শেখ মুজিবকে প্রতিরক্ষা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার তাকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী হিসেবে অভিযুক্ত করে এবং '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় পর্যন্ত তিনি কুর্মিটোলা সেনানিবাসে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। দল হিসেবে শেখ মুজিবের ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগও সে সময় অত্যন্ত দুর্বল ও বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। এর কারণ, একদিকে ৬ দফা প্রভাব সৃষ্টি করার মতো জনসমর্থন অর্জন করতে পরেনি, অন্যদিকে ৬ দফার প্রশ্নেই আওয়ামী লীগ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের ২৩ ও ২৭ আগস্ট গঠিত হয়েছিল যথাক্রমে 'পিডিএমপন্থী' এবং '৬ দফাপন্থী' নামে পরিচিতি পাওয়া পৃথক দু'টি আওয়ামী লীগ। বন্দী নেতা শেখ মুজিবকে ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের সভাপতি বানানো হয়। 'পিডিএমপন্থী' আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ– যিনি এর আগে শেখ মুজিবের দলেরও সভাপতি ছিলেন।

আওয়ামী লীগের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে দুটি মাত্র

তথ্যের উল্লেখ করলে। প্রথম তথ্যটি হলো, ১৯৬৬ সাল থেকে তো বটেই, দলের সভাপতি শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী বানানোর পরও ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগ কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়ার সাহস পায়নি। দলের ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে অভিযুক্ত নেতাকে 'আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য' সরকারের প্রতি 'আবেদন' জানানো হয়েছিল (২১ জানুয়ারি, ১৯৬৮)। দ্বিতীয় তথ্যটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে ঘোষিত ১১ দফার সমর্থনে এগিয়ে আসার পরিবর্তে ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগ ৮ জানুয়ারি গঠিত আটদলীয় জোট ড্যাক বা ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটিতে যোগ দিয়েছিল। ড্যাক-এর ৮ দফা কর্মসূচিতে সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় দাবি স্বায়ত্তশাসন শব্দটিরও উল্লেখ ছিল না, অনুপস্থিত ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রসঙ্গও। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের দুই নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং খান আবদুল ওয়ালী খানের সঙ্গে তৃতীয় নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের মুক্তি চাওয়া হয়েছিল পঞ্চম তথা '৬' দফায়। অন্য একটি কারণেও শেখ মুজিব অসম্মানিত হয়েছিলেন। ড্যাক-এর আহবায়ক ছিলেন পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি নওয়াবজাদা নসলল্লাহ খান। অর্থাৎ, ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের অবস্থা সে সময় এতটাই শোচনীয় ছিল যে, দলটিকে শেখ মুজিবের প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের নেতৃত্বাধীন এবং পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সাতটি দলের সমন্বয়ে গঠিত জোট ড্যাক-এর শরিক হতে হয়েছিল। উল্লেখ্য, মওলানা ভাসানীর দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কিন্তু এই জোটে যোগ দেয়নি বরং স্বাধীন অবস্থানে থেকে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল।

'৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান নির্মাণেও শেখ মুজিব বা আওয়ামী লীগের সামান্য অবদান ছিল না। শেখ মুজিব তেমন অবস্থাতেই ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেছিলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (যে কথা অওয়ামী 'মোড়ল'ও স্বীকার না করে পারেননি)। স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সালের ৬ ডিসেম্বর মওলানা ভাসানী ঐতিহাসিক 'ঘেরাও' আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং পল্টন ময়দানের জনসভায় আগত লক্ষাধিক মানুষকে নিয়ে সেদিনই ঘেরাও করেন গভর্নর হাউস (বর্তমান বঙ্গভবন)। ঘেরাওকারী ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী পরদিন ঢাকায় হরতাল আহ্বান করেন।

১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে দু'জনের

মৃত্যু ঘটলে মওলানা ভাসানী ৮ ডিসেম্বর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালনের ডাক দেন। তিনি নিজে সেদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন এবং লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে শহীদদের গায়েবানা জানাযা নামাজে ইমামতি করেন। মওলানা ভাসানীর ঘেরাও আন্দোলন স্বল্প সময়ের মধ্যে সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং মূলত এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় তিনটি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি। ১১ দফা ঘোষিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালের ১৪ জানুয়ারি।

২০ জানুয়ারি মওলানা ভাসানী সমর্থক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসাদুজ্জামানের মৃত্যু ১১ দফার আন্দোলনকে প্রচণ্ড করে তোলে এবং মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ভিত নাড়িয়ে দেয়। বিপন্ন আইয়ুব খান আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দেন (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯)। ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগসহ আটদলীয় জোট ড্যাক-এর পক্ষ থেকে প্রথম সুযোগেই বৈঠকে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু আন্দোলরত ছাত্র-জনতা সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে, মওলানা ভাসানী একে 'আত্মহত্যার শামিল' বলে বর্ণনা করে আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারি পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় 'চরমপত্র' উচ্চারণ করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, 'প্রয়োজনে ক্যান্টনমেন্ট ভেঙে শেখ মুজিবকে মুক্ত করা হবে।' উল্লেখ্য, আন্দোলনে অগ্রগতির পাশাপাশি শেখ মুজিবসহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি তখন সামনে চলে এসেছিল এবং শেখ মুজিব বন্দী অবস্থায়ই প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিতে সম্মতি জানিয়েছিলেন বলে গুজব রটেছিল। এর পেছনে ছিল শেখ মুজিবের সঙ্গে সরকারের গোপন আয়োজন। কিন্তু ছাত্র-জনতার চাপ, বেগম মুজিবের হস্তক্ষেপ এবং মওলানা ভাসানীর বিরোধিতায় সে আয়োজন ভন্ডুল হয়ে যায়। ফলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে নতিস্বীকার করতে হয়। '৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবসহ মামলার অভিযুক্তরা ও অন্য রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তিলাভ করেন।

কিন্তু এই সাফল্যের পর থেকেই নিশ্চিত বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে আসা গণঅভ্যুত্থান বিভ্রান্ত ও স্তিমিত হতে শুরু করেছিল। মওলানা ভাসানীর আপত্তি সত্ত্বেও আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার উদ্দেশে 'নিশ্চিন্ত' থাকার' উপদেশ দিয়ে শেখ মুজিব ২৬ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। বৈঠকে তাকে বক্তৃতা করার সুযোগ দেযা হয় আরো পরে, ১০ মার্চ। ঘটনাক্রমে ১১ দফার কথা উচ্চারণ করলেও এই ভাষণেই শেখ মুজিব তার বিস্মৃত প্রায় ৬ দফাকে প্রাধান্যে নিয়ে আসেন এবং গোপন সমঝোতাসহ পৃথকভাবে আয়োজনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু

বৈঠক বর্জনকারী প্রধান নেতা মওলানা ভাসানীর প্রবল বিরোধিতায় সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং অবনতিশীল পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেন। আইয়ুব খান পদত্যাগের মাধ্যমে বিদায় নেন, সেই সাথে পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয় (২৫ মার্চ, ১৯৬৯)।

'লৌহ মানব' আইয়ুব খান ও তার সরকারের পতন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল ও শেখ মুজিবসহ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির নীতিগত স্বীকৃতি ছিল গণঅভ্যুত্থানের উলেখযোগ্য সাফল্য। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনসহ ১১ দফার মূল দাবিগুলো আদায় করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক নেতাদের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের আন্দোলনবিমুখ নীতি ও কৌশল ছিল অসফলতার প্রধান কারণ। গণঅভ্যুত্থানকে নস্যাৎ করার কৌশল হিসেবেই যে গোলটেবিল বৈঠক পরিকল্পিত হয়ছিল, সেকথা ইতিহাস প্রমাণ করেছে। শেখ মুজিবের মুক্তি অর্জন এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল করানোর মতো দাবি আদায়ের জন্য যেখানে কোনো বৈঠকের প্রয়োজন হয়নি, সেখানে অন্য দাবিগুলোও আন্দোলনের মাধ্যমেই আদায় করা সম্ভব হতো। কিন্তু শেখ মুজিব মুক্তিলাভের পর ৬ দফাপন্থী অওয়ামী লীগ সে গণঅভ্যুত্থানকেই স্তিমিত ও বিভ্রান্ত করার নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর কৌশল নিয়েছিল, যে গণঅভ্যুত্থানের প্রচণ্ড চাপে শেখ মুজিব ফাঁসির মুখ থেকে ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এর ফলে এই অভিযোগ সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, জনগণের মুক্তি অর্জনের মৌলিক প্রশ্নেই আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনীতি ছিল বিভ্রান্তিপূর্ণ, ক্ষতিকর ও প্রশ্নসাপেক্ষ। সেই সাথে ছিল দল হিসেবে আওয়ামী লীগের এবং নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য। না হলে আওয়ামী লীগ ছাত্র সমাজের ১১ দফাকে নিয়েই এগিয়ে যেতো। কারণ, ১১ দফার দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফা দু'টি মূলত ৬ দফার আলোকে প্রণীত হয়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ১১ দফাকে পাশ কাটিয়ে গেছে এবং কিছুদিন পর্যন্ত '৬ দফা ও ১১ দফা' বলার পর এক পর্যায়ে ১১ দফাকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় করেছে, প্রাধান্যে এনেছে কেবলই ৬ দফাকে। এই প্রক্রিয়ায় ১১ দফাভিত্তিক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অর্জিত শেখ মুজিবের প্রভাব ও জনপ্রিয়তাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৬ দফাকে একমাত্র কর্মসূচি বানিয়েছে এবং সে নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকে এমন প্রচারণাকে শক্তিশালী করেছে, যেন '৬৯-এর

গণঅভ্যুত্থানও ঘটেছিল ৬ দফার ভিত্তিতে, ১১ দফার ভিত্তিতে নয়! যেন শেখ মুজিব একাই ছিলেন গণঅভ্যুত্থানের প্রধান নেতা! অথচ ইতিহাস প্রমাণ করেছে, গণঅভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত ছাত্র-জনতা ৬ দফার সমর্থনে সামান্যও ভূমিকা পালন করেনি। আর সে কারণেই ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।

এখানে ইতিহাসের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। আমার উদ্দেশ্য আসলে আওয়ামী 'মোড়ল'-এর মিথ্যাচার সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করা এবং তাকেও জানিয়ে দেয়া যে, গালগল্পকে ইতিহাস হিসেবে চালানোর অপচেষ্টায় তার সাফল্যলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। তার কৌশল ও উদ্দেশ্য অবশ্য ধরা পড়ে গেছে। আমি মনে করি, 'মোড়ল' চেষ্টা চালালেও মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের সম্পর্ক কোনো সময়ই 'প্রায় দা-কুমড়োর মতো' ছিল না। পরস্পরের 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ'ও ছিলেন না তারা। পাকিস্তান আমলে একযোগে তারা স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলন করেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধেও দু'জনের বিপুল অবদান ছিল– মওলানা ভাসানী প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছেন, অন্যদিকে স্বেচ্ছায় গ্রেফতার বরণ করলেও শেখ মুজিব থেকেছেন জাতীয় নেতার অবস্থানে। লক্ষ্যণীয় যে, শেখ মুজিবকে প্রাধান্যে রাখার উদ্দেশ্য থেকে একটু এদিক-সেদিক করতে চাইলেও আওয়ামী 'মোড়ল'-এর পক্ষে কিন্তু মওলানা ভাসানীর অবদান অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি। 'রীতিমতো মাস্টার স্ট্রোক' ধরনের মন্তব্যের মাধ্যমে প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করেছেন, মওলানা ভাসানীর সমর্থন পেয়েছিলেন বলেই শেখ মুজিব এতটা এগোতে পেরেছিলেন। বাংলাদেশও স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। আমার ধারণা, কাণ্ডজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হয়ে থাকলে কথা এটুকুই যে কারো জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। বলা দরকার, বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার ঐক্য নিয়ে প্যাঁচালের মধ্য দিয়ে আওয়ামী 'মোড়ল' যে শোরগোল তুলতে চাইছেন, সে ব্যাপারে আমার অন্তত সামান্যও আগ্রহ নেই। আমি বড়জোর 'হাতি-ঘোড়া গেলো তল' বিষয়ক প্রবাদবাক্যই স্মরণ করিয়ে দিতে পারি।

- আওয়ামী ' মোড়ল' বলতে আবদুল গাফফার চৌধুরীকে বোঝানো হয়েছে।
- উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ, দৈনিক ইনকিলাব, ১৮.৪.২০০৫

মওলানা ভাসানী ও সিরাজ সিকদারের সম্পর্ক

সাধারণ কাউকে দিয়ে অসাধারণ কাজও হয়ে থাকে বলে একটি কথা রয়েছে। কথাটা যে কত সত্য তার প্রমাণ পেয়েছিলাম ১৯৭৩ সালে। কলেজ ছাত্র আমি তখন অতি সাধারণ একজন। কিন্তু আমার মাধ্যমেই মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী ও বিপ্লবী নেতা কমরেড সিরাজ সিকদারের সম্পর্ক তথা প্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে হলে এই দু'জন সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। বাংলাদেশের জাতীয় নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। মূলত স্বায়ত্তশাসন আদায় ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে দল ও সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেছিলেন। পাকিস্তান ন্যাপেরও সভাপতি তিনিই ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমিক আন্দোলনসহ স্বায়ত্তশাসনের জন্য 'দীর্ঘ সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে মওলানা ভাসানী বলিষ্ঠভাবে অগ্রবর্তী অবস্থানে থেকেছেন। পালন করেছেন দুর্দান্ত সাহসী ভূমিকা। স্বাধীনতা যুদ্ধেরও প্রধান নির্মাতা ছিলেন মওলানা ভাসানী। ১৯৭০ সালের ৩০ নভেম্বর এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। ৪ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশে পবিত্র কুরআনের সুরা 'কাফেরুন' থেকে আয়াত উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন' (তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম)। অর্থাৎ তুমি থাকো তোমার মতো, আমাকে আমার মতো থাকতে এবং স্বাধীন হতে দাও। ভারতের হাতে নিজের স্বাধীনতা তুলে দিতে হলেও মওলানা ভাসানী স্বাধীনতা যুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বাধীনতার পরও তাঁর সে দেশপ্রেমিক ভূমিকা অব্যাহত ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের শোষণ, লুণ্ঠন ও ভারতমুখী নীতি ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। ভারতের সম্প্রসারণবাদী হস্তক্ষেপ ও কর্মকান্ডের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার থেকেছেন এবং মৃত্যুর মাত্র ছয় মাস আগে, প্রায় ৯৬ বছর বয়সেও ঐতিহাসিক

ফারাক্কা মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন (১৬ মে, ১৯৭৬)। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন মওলানা ভাসানী।

অন্যদিকে সিরাজ সিকদার ছিলেন 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি'র চেয়ারম্যান। ১৯৬৮ সাল থেকে তৎপর সর্বহারা পার্টির প্রথম নাম ছিল 'মাও সে তুঙ গবেষণা কেন্দ্র'। ভাসানীপন্থী ও চীনপন্থী হিসেবে পরিচিত 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' (মেনন গ্রুপ)-এর মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ সংগঠনটি গণচীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুঙের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র এবং চীন ও রাশিয়া তথা অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নিয়ে জোর চেষ্টা চলতো। চীনপন্থীরা সাধারণভাবে ভাসানীপন্থী এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) ও কৃষক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু 'সমাজতান্ত্রিক' না 'জনগণতান্ত্রিক' নাকি 'নয়াগণতান্ত্রিক' বিপ্লব করতে হবে– এ ধরনের বিচিত্র বিতর্কে জড়িয়ে তারা কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। 'হক-তোয়াহা' (আবদুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহা), 'মতিন-আলাউদ্দিন' (পাবনার আবদুল মতিন ও আলাউদ্দিন আহমদ), 'দেবেন-বাশার' (চট্টগ্রামের দেবেন শিকদার ও আবুল বাশার) এবং 'জাফর-মেনন' (কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেনন) গ্রুপ নামে তারা পরিচিতি পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে 'হক-তোয়াহা' গ্রুপ ছাড়া বাকি সবাই ১৯৬৯-১৯৭০ সালের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার কর্মসূচি উপস্থাপন করেছিলেন।

চীনপন্থীদের ভাঙনের এই ধারাতেই গঠিত হয়েছিল সিরাজ সিকদারের 'মাও সে তুঙ গবেষণা কেন্দ্র'। ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে প্রকৌশলী সিরাজ সিকদার কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ)-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিরাজ সিকদারের সংগঠনটিকে 'টেস্ট টিউব' নামে ব্যঙ্গ করা হতো। পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লব করার উদ্দেশ্যে সিরাজ সিকদার প্রথম থেকেই 'আন্ডারগ্রাউন্ডে' চলে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ সংগঠনের সকল তৎপরতা চালানো হতো গোপনে। পাকিস্তান যুগের শেষ দিকে, বিশেষ করে ঢাকায় তারা দু-চারটি পটকা ধরনের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সিরাজ সিকদার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিলেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিশ্বাস করতেন না। দাবি করা হয়, তার দল একই সঙ্গে মুক্তি বাহিনী এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল– যদিও তেমন যুদ্ধের উদাহরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে বরিশাল জেলার পেয়ারাবাগান এলাকায়

'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি' গঠন করা হয়েছিল। সিরাজ সিকদার নিজেই পার্টির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর সিরাজ সিকদার বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার মতে পূর্ব বাংলা ভারতের 'নয়া উপনিবেশে' পরিণত হয়েছিল। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি নতুন করে মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি'র নামে শুরু হয়েছিল বিচ্ছিন্ন বোমাবাজি। কোথাও কোথাও পুলিশ ফাঁড়ি লুটের মতো ঘটনাও ঘটেছে। সব মিলিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশে সিরাজ সিকদার আলোড়ন তুলতে এবং সরকারকে তটস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকার সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল। 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি'র সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হতো গোপনে, রহস্যময়তার সঙ্গে। ফলে বিশেষ করে ছাত্র-যুবকদের একটি অংশের মধ্যে এই পার্টি সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছিল।

আমার নিজের কথা অবশ্য আলাদা। কারণ, পাকিস্তানের শেষ দিনগুলোতে আমি পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। অন্তরালে এর প্রকৃত নেতা ছিলেন কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেনন। আবদুল মাননান ভুইয়া, মোস্তফা জামাল হায়দার ও আবদুল্লাহ আল নোমানের মতো ছাত্র ইউনিয়নের আরো অনেক প্রাক্তন নেতাও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের প্রথম জেলা সম্মেলনে আমাকে টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছিল। ১১ দফাভিত্তিক ছাত্র-গণঅভ্যুত্থানে আমার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। ১৯৬৯ সালের মার্চ থেকেই আমরা স্বাধীনতার জন্য আহবান জানিয়ে আসছিলাম। শুধু স্বাধীনতা নয়, আমাদের লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে আমরা পাকিস্তানের নির্বাচন বর্জন করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করার আহবান জানিয়ে অনেক লিফলেট প্রকাশ করেছি। টাঙ্গাইলের বহু দেয়ালে ও টিনের বেড়ায় 'চিকা' মেরেছি। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে আমার মতো নেতা-কর্মিদের আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি না থাকলেও নেতারা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিলেন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হামলা ও গণহত্যার মুখে স্বাধীনতার জন্য সত্যিকারের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নেতাদের কথামতো আমরা কোনো অস্ত্র পাইনি। ফলে আওয়ামী লীগের অনেক আগে থেকে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা চালিয়ে এলেও আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে, ১৯৭১ সালের ২৫ এপ্রিল হঠাৎ গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় স্বাধীনতাযুদ্ধে

সরাসরি ভূমিকা পালন করতে পারিনি। এজন্য লজ্জার শেষ না থাকলেও আমি অবশ্য আনন্দিত ও গর্বিতও বোধ করি। কারণ, যে স্বাধীনতা আমাদের লক্ষ্য ছিল অন্যভাবে হলেও সে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি।

কথাগুলো বলার কারণ, বিপ্লব বা সশস্ত্র কর্মকান্ড আমার জন্য নতুন কিছু ছিল না। সে জন্য এবং ১৯৭২ সালের মার্চ থেকে সাপ্তাহিক 'হক-কথা'র মাধ্যমে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় সর্বহারা পার্টি, সিরাজ সিকদার বা দলটির কর্মকান্ডের ব্যাপারে আমার তেমন আগ্রহ বা আকর্ষণ ছিল না। আমি সর্বহারা পার্টির স্বাধীনতা সংক্রান্ত বিশ্লেষণ এবং নতুন মুক্তিযুদ্ধের তত্ত্বের সঙ্গেও ভিন্নমত পোষণ করতাম।

মওলানা ভাসানীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল বলেই সর্বহারা পার্টি আমার দিকে নজর ফেলেছিল। ১৯৭২ সালের কোনো এক সময় থেকে তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। তাদের ভাষায় আমি ছিলাম পার্টির একজন 'সিমপ্যাথাইজার'। তারা মাঝে-মধ্যে আমাকে বইপত্র দিতো, অবশ্য টাকার বিনিময়ে। যেমন সিরাজ সিকদারের প্রথম কবিতার বই কিনেছিলাম ১৯৭৩ সালে। নাম ছিল 'গণযুদ্ধের পটভূমি'। কখনো কখনো স্বল্প পরিমাণে, পাঁচ-দশ টাকা চাঁদাও তাদের দিতাম। ভিক্টোরিয়া রোডে আমাদের বাসার কাছে অবস্থিত 'আপ্যায়ন' হোটেলের মালিক শুকুর মিয়াকে বলা ছিল। ওরা বাকিতে খেতে পারতো। পরে কখনো ওরা, কখনো আমি টাকাটা দিয়ে দিতাম। সর্বহারা পার্টির টাঙ্গাইলের দায়িত্বে ছিলেন হাবিব নামের এক যুবক। গায়ের রং ছিল কালো। পরে জেনেছি তার আসল নাম মাঈনুদ্দিন। বাড়ি মানিকগঞ্জে। ব্যক্তিগত জীবনে এমবিবিএস ডাক্তার। হাবিবের সঙ্গে আমার সর্বশেষ দেখা হয় ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম. এ. ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। থাকতাম হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে। হলের রিসেপশন রুমে বসে কথা বলছিলাম। হঠাৎ সেখানে হাবিব গিয়ে হাজির। গিয়েছিলেন আমার ক্লাসমেট মানিকগঞ্জের হেলালের কাছে। হেলাল আমাদের পূর্ব পরিচিতি দেখে খুবই অবাক হয়েছিল। হাবিব খেয়েছিলেন থতমত। হেলালের কাছেই জেনেছিলাম, হাবিব তথা মাঈনুদ্দিন একজন ডাক্তার।

এই হাবিবই ১৯৭৩ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সিরাজ সিকদারের একটি বৈঠক করিয়ে দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। তার সঙ্গে অন্য একজন যুবক ছিল, যার বাড়ি টাঙ্গাইলের বাসাইল থানার কোথাও। আমাকে বেছে নেয়ার কারণ জানাতে গিয়ে হাবিব বলেছিলেন, তারা আরো

দু'জনের কথাও চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তাদের ওপর ভরসা পাননি। আমাকেই তাদের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে।

মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সিরাজ সিকদার ও সর্বহারা পার্টির তখনও পর্যন্ত কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই জেনে বেশ অবাক হয়েছিলাম। কারণ, মওলানা ভাসানী তখন আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী প্রধান জাতীয় নেতা। প্রকাশ্যে তৎপর রাজনীতিকরা তো বটেই, 'মুসলিম বাংলা' ধরনের সশস্ত্র কর্মকান্ডে যুক্ত ইসলামী সংগঠনসহ 'আন্ডারগ্রাউন্ডে' থাকা বামপন্থী প্রায় সকল নেতাও মওলানা ভাসানীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। মওলানা ভাসানী অনেককেই সরকারের রোষানল থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর পরামর্শে অনেকে 'আন্ডারগ্রাউন্ড' থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্য রাজনীতিতে ফিরে এসেছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকারও মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতো। প্রকাশ্য বিরোধিতা সত্ত্বেও একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে মওলানা ভাসানী সরকারকেও পরামর্শ দিতেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মাঝে-মধ্যেই একাকী সন্তোষে চলে যেতেন। খন্দকার মোশতাক আহমাদসহ মন্ত্রীদের অনেকেও তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এ সব জানতাম বলেই আমার ধারণা ছিল, সিরাজ সিকদারের সঙ্গেও মওলানা ভাসানীর যোগাযোগ রয়েছে। সুতরাং দু'জনের বৈঠক করিয়ে দেয়ার প্রস্তাবে অবাক না হয়ে পারিনি।

ওদিকে কিছুটা বিব্রত হলেও এক কথায় রাজি হয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। প্রস্তাব ছিল, প্রথমে সিরাজ সিকদারের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং তারপর কোনো এক সময় অনুষ্ঠিত হবে দু'জনের বৈঠক। সে অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে দুপুর একটার দিকে টাঙ্গাইলের দায়িত্বে থাকা হাবিব এবং কেন্দ্রীয় এক নেতা আমার সঙ্গে টাঙ্গাইল সদর থানার উল্টোদিকে অবস্থিত একটি টিনের হোটেলে মিলিত হন। হোটেলটিকে বেছে নেয়ার কারণ, থানার ঠিক মুখোমুখি বলে পুলিশ বা গোয়েন্দারা সহজে সন্দেহ করবে না। দ্বিতীয়ত, এর অবস্থান ছিল টাঙ্গাইল শহর থেকে সন্তোষ যাওয়ার পথে– মেইন রোডে। সেখানে চা খেয়ে দুটি রিকশায় আমরা সন্তোষ যাই। পরে জেনেছি, ওই নেতার প্রকৃত নাম মহসীন। পুরো নাম ভুলে গেছি, তবে তিনিও প্রকৌশলী ছিলেন। তার মাথায় টাক ছিল এবং তোতলা এই নেতার কথা জড়িয়ে যেতো। পরবর্তীকালে হাবিবের পর টাঙ্গাইলের দায়িত্বে আসা সর্বহারা পার্টির আরেক নেতা ডা. সৈয়দ রিয়াজুর রহমান শাহিলের কাছে জেনেছি, কমরেড মহসীনের বাড়ি ছিল মাদারিপুরে। সিরাজ সিকদারের মৃত্যুর পর আন্তঃপার্টি সংঘাতে তিনি মারা গেছেন।

রিকশায় সন্তোষে পৌঁছেছিলাম নিরাপদেই। মওলানা ভাসানীর পত্রিকা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজকর্মে জড়িত ছিলাম বলে মাঝে-মধ্যেই সন্তোষ যাতায়াত করতাম। গোয়েন্দারাও চিনতো। সে কারণে তারা সন্দেহ করেনি। কমরেড মহসিন ও হাবিবকে আমি মওলানা ভাসানীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। দু'জনকে নিয়ে মওলানা ভাসানী তাঁর টিনের ঘরে ঢুকেছিলেন। আমার কাছে আগেই তিনি দুপুরে তাদের খাওয়ার কথা বলে রেখেছিলেন। খাবার দেয়া হয়েছিল মাটির মেঝেতে পাটি বিছিয়ে। খাওয়া শুরু হওয়ার পর মওলানা ভাসানী সুকৌশলে আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সিরাজ সিকদারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঠিক কি আলাপ হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাকে জানতে দেননি। সেদিন খুব খারাপ লাগলেও পরবর্তীকালে বুঝেছি, মওলানা ভাসানী আমাকে ঝামেলা ও বিপদমুক্ত রাখার জন্যই বৈঠকে থাকতে দেননি। কারণ, সিরাজ সিকদারকে তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেননি। শুনেছি, সিরাজ সিকদারও নাকি অবিশ্বস্ততার কাজ করেছিলেন। আমি মওলানা ভাসানীর ইশারা-ইঙ্গিত বুঝতাম। তাই দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দিয়েই আমি চলে এসেছিলাম।

এর কিছুদিনের মধ্যেই মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন সিরাজ সিকদার। বিস্তারিত জানতে না পারলেও এটুকু বুঝেছিলাম, আওয়ামী লীগ সরকার এবং ভারতের সম্প্রসারণবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন শক্তিশালী করার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ঐকমত্য হয়েছিল। সে ঐকমত্যের ভিত্তিতেই ১৯৭৩ সালের বিজয় দিবসে সর্বহারা পার্টির ডাকা হরতালের প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন মওলানা ভাসানী। তাঁর পক্ষে লেখা লিফলেটের খসড়া নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন হাবিব। আমি সেটা নিয়ে দেখিয়েছিলাম মওলানা ভাসানীকে। তিনি সম্মত হয়েছিলেন। মওলানা ভাসানীর স্বাক্ষরের ব্লকটি সন্তোষের 'শান্তি প্রেস' থেকে আমি এনে দিয়েছিলাম। লেটার প্রিন্টিং-এর সে যুগে ব্লক ব্যবহার করতে হতো। হাবিবরা ব্লকটিকে ঢাকায় এনে হরতালের প্রচারপত্রে ছাপানোর পর আমাকে আবার ফেরৎ দিয়েছিলেন। আমিও দিয়ে এসেছিলাম শান্তি প্রেসে। সিরাজ সিকদারের পার্টি মওলানা ভাসানীর এই সমর্থনকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। হরতাল পালিত না হলেও ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল। এর কারণ ছিল বোমাবাজি।

এভাবে আমার মতো অতি সাধারণ একজনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মওলানা ভাসানী ও সিরাজ সিকদারের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক আদৌ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল কি না সে ব্যাপারে আমার অবশ্য সন্দেহ রয়েছে। কারণ, মওলানা

ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি স্বাধীনতায় বিশ্বাসও করতেন। অন্যদিকে সিরাজ সিকদার মনে করতেন, বাংলাদেশ ভারতের উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া বোমাবাজি ও সশস্ত্র কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চাইতেন। আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে কর্মকান্ড চালাতেন বলে জনগণের সঙ্গে তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল না। জনগণ তাকে চিনতোই না। কিন্তু মওলানা ভাসানী ছিলেন মজলুম জননেতা। তিনি করতেন গণতন্ত্রসম্মত রাজনীতি। চিন্তা ও কৌশলগত এ পার্থক্যের জন্যই মওলানা ভাসানী ও সিরাজ সিকদারের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। এ ব্যাপারে অন্য কোনো উপলক্ষে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

'অনুসরণ', দৈনিক আমার দেশ, ১৭.১১.২০১১

নজরুলের ধর্মচিন্তা এবং মওলানা ভাসানীর ইঙ্গিত

বাংলাদেশের অন্য সব মানুষের মতো কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাকেও ছোটবেলা থেকেই গভীরভাবে আকর্ষণ করেছেন। ১৯৬০-এর দশকে ছাত্র রাজনীতি এবং পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছিলাম বলে নজরুলের কবিতা ও সংগীত আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। সত্যি বলতে কি, ঘটনাক্রমে কবিতা আবৃত্তির বাইরে নজরুলের সাহিত্য খুব বেশি পড়া হয়নি। কিন্তু নজরুলকে নিয়ে, তাঁর জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে বহু আলোচনা শুনেছি। কিছু কিছু পড়েছিও। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, গ্রেফতার ও কারাবাস থেকে দারিদ্র্য, বিয়ে ও পারিবারিক জীবন পর্যন্ত সব বিষয়েই আমাদের আগ্রহ ছিল তুমুল রকমের। কেন ও কিভাবে তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং চিরদিনের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তা নিয়েও কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এ সম্পর্কে নানান কাহিনী শোনা যেতো। এসবের মধ্যে আবার চমৎকার কৌশলে সাম্প্রদায়িক উপাদানও মিশিয়ে দেয়া হতো। বিভ্রান্ত হইনি সত্য তবে আমরাও জল্পনা-কল্পনা কম করতাম না। এখনও বিশেষ করে নজরুলের ধর্মীয় চিন্তার বিষয়টি আমাকে ভাবায়। যেহেতু বিস্তারিত পড়িনি এবং গবেষণা করিনি, সেহেতু জোর দিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। উচিত তো নয়ই।

তাই বলে একেবারে থেমেই বা যাওয়া কেন? দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ তো করাই যেতে পারে। যেমন মুসলমান হলেও কবি বিয়ে করেছিলেন আশালতা সেনগুপ্তাকে, পরবর্তীকালে যিনি প্রমীলা নজরুল নামে পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁরা কেউই ধর্মান্তরিত হননি, যার যার ধর্ম পালন করেছেন। শ্বাশুড়ি গিরিবালা দেবী তো বহু বছর নজরুলের সঙ্গেই থেকেছেন। কবির বাসায় তার জন্য সব সময় আলাদা পূজার ঘর থাকতো। সেখানে তিনি পূজা-অর্চনা করতেন। নজরুল ও প্রমীলা ধর্ম পরিবর্তন না করার কারণে তাঁদের কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চাইত না। রক্ষণশীল হিন্দুরা এমনকি এ চেষ্টাও করতো, যাতে কোনো হিন্দু মালিক তাঁদের বাড়ি ভাড়া না দেয়। সে কারণে নজরুলকে হুগলী ও কৃষ্ণনগরের মতো বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। কলকাতায়ও তিনি এক বাড়িতে বেশিদিন বসবাস করতে পারেননি। অভাব ও দারিদ্র্যের পাশাপাশি ধর্মের বিষয়টি তাঁকে সব সময়

তাড়িয়ে বেড়াতো। এভাবে অবশ্য কুপোকাত করা যায়নি নজরুলকে। কারণ, প্রমীলা ছিলেন তার স্বপ্নের 'রাণী'– যার কাছে তিনি 'হার' মেনেছিলেন 'আজ শেষে'।

নজরুল তাঁর প্রথম ছেলের নাম রেখেছিলেন 'কৃষ্ণ মোহাম্মদ'। আজাদ কামালও তারই নাম ছিল, কিন্তু বেশি আলোচিত ও পরিচিত হয়েছে ওই কৃষ্ণযুক্ত নামটি। নামের দ্বিতীয় অংশের তাৎপর্য নিয়ে সম্ভবত কথা বাড়ানোর দরকার পড়ে না। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ধর্মের ব্যাপারে নজরুলকে এক বিচিত্র ভাবনা ও ইচ্ছা পেয়ে বসেছিল। কবির দ্বিতীয় ছেলের নাম ছিল অরিন্দম। অন্য দুই ছেলে কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ নাম দুটিও কালের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক মুসলমানসুলভ ছিল না। বিয়ে বা সন্তানদের নাম সম্পর্কেই শুধু বলা কেন, লেখালেখিতেও তো কম দেখাননি তিনি। হিন্দুদের পুরাণ ও মহাভারতের কাহিনীনির্ভর 'শকুনিবধ','রাজা যুধিষ্ঠিরের সং' ও 'দাতা কর্ণ'সহ অসংখ্য নাটক ও রচনা রয়েছে তাঁর। হিন্দুদের মতো শক্তিরও পূজারী ছিলেন তিনি। শিব, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী এবং রাধা ও কৃষ্ণসহ হিন্দুদের দেব-দেবীদের নিয়ে শ্যামা সংগীত, ভজন, আগমনী ও কীর্তনও তিনি অনেকেই রচনা করেছেন।

একই নজরুল আবার প্রধানত ফার্সী ও উর্দুতে রচিত গজলের অনুকরণে বাংলায় গজল লিখেছেন। গোলাপের কাছে জানতে চেয়েছেন, এই ফুল নবীর তথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পায়ে চুমু খেয়েছিল বলেই তাঁর খুশবু আজও গোলাপের তৈরি আতরে পাওয়া যায় কি না? বুলবুলিকে জিজ্ঞেস করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাম জপেছিল বলেই তার কণ্ঠও এত মধুর কি না? পবিত্র আল-কোরআন, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.), নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতও এসেছে নজরুলের প্রধান বিষয় হিসেবে। হজরত ওমর (রা.), হজরত আলী (রা.) প্রমুখকেও নজরুলই ইতিহাসের আলোকে সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাই বলে ধর্মান্ধতার শিকার হননি বরং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'টিকি' রাখলেই হিন্দু পন্ডিত হওয়া যায় না, মুসলমান মোল্লা হওয়া যায় না 'দাড়ি' রাখলেই। নজরুল একই সঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে 'মানুষ' হওয়ার জন্যও হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃস্টানদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

কে জানে, এভাবেই নজরুলের ভেতরে নতুন ধরনের কোনো ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক চিন্তা দৃঢ়মূল হয়েছিল বা হচ্ছিল কি না। এখানে নজরুল সম্পর্কে মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য স্মরণ করা যায়। মওলানা ভাসানী শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, পীর বা কামেল দরবেশ হিসেবেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পাশাপাশি

আসামসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর মুরিদের সংখ্যা কয়েক লাখ। নজরুল প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানীকে হঠাৎ টেনে আনার বিশেষ কারণ রয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, কাজী নজরুল ও মওলানা ভাসানীর শৈশব ও কৈশোরে অনেক মিল রয়েছে। অভিভাবকহীন অবস্থায় নজরুল তথা 'দুখু মিয়া' ওই বয়সে এক খুঁটি থেকে অন্য খুঁটিতে গেছেন। 'চ্যাকা মিয়া' নামে পরিচিত মওলানা ভাসানীর অবস্থাও ছিল নজরুলের মতোই। কৈশোরে 'দুখু মিয়া' ঘেটু দলে অর্থাৎ যাত্রা দলে যোগ দিয়েছিলেন। 'চ্যাকা মিয়া' নামের মওলানা ভাসানীকেও কৈশোরে ঘেটু দলের সঙ্গেই একটা সময় কাটাতে হয়েছিল। নজরুল 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন, মওলানা ভাসানীও সারা জীবন শুধু আন্দোলনই করেছেন। তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন 'প্রোফেট অব ভায়োলেন্স' নামে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী সাপ্তাহিক 'টাইম' ম্যাগাজিন এই 'প্রোফেট অব ভায়োলেন্স' ভাসানীকে নিয়েই প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশ করেছিল।

১৯২৮ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত সময়কালে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে কবি নজরুলের বহুবার দেখা ও কথা হয়েছে। আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি হিসেবে মওলানা ভাসানী সে সময় অবিভক্ত বাংলা ও আসামের বিভিন্ন এলাকায় বহু কৃষক-প্রজা সম্মেলন করেছেন। কিন্তু অনেক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মূলত ভবঘুরে ধরনের স্বভাবের কারণে নজরুলকে কোনো সম্মেলনে অতিথি করে আনতে পারেননি। এই দুঃখের কথা তিনি নিকটজনদের কাছে বলেছেন। নজরুল সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর চিন্তা ঠিক সাধারণ মানুষের মতো ছিল না। যেমন তিনি মনে করতেন, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে নজরুল আধ্যাত্মিক সাধনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম পীর বা সুফীদের তরিকার সঙ্গে বৈদিক তন্ত্র-মন্ত্রের অনুশীলন ও মিশ্রণ করতে গিয়ে নজরুল সম্ভবত ভারসাম্য রাখতে পারেননি। দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, মুসলমানদের ক্ষেত্রে পীর-দরবেশের এবং হিন্দুদের ক্ষেত্রে গুরুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান তথা নির্দেশনা ও পরিচালনা ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিক সাধনায় সফল হওয়া সম্ভব নয়। তাকে দিকভ্রান্ত হতেই হবে। এজন্যই বহু মানুষকে এখনও পাগল হয়ে যেতে দেখা যায়। ভাসানী অনুসারী অনেকের ধারণা, মওলানা ভাসানী সম্ভবত বোঝাতে চাইতেন, দেহ ও মনোজগতে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রচন্ড সংঘর্ষের পরিণতিতেই নজরুল বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

মওলানা ভাসানী তাঁর এক কৌতূহলী ভক্তকে বলেছিলেন, নজরুল 'যে দেখা দেখতে গিয়ে' নিজেই অন্যের 'দেখার বিষয়ে' পরিণত হয়েছেন তার 'খোঁজ' করো না কেন? নজরুলের উপলব্ধি সম্পর্কে বুঝতে হলে প্রথমে সেই জগতে পৌঁছাতে

হবে, যে জগতে তাঁর বিচরণ ছিল। মওলানা ভাসানীর এই কথাটা কিন্তু কথার কথা ছিল না।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পর কবিকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হলে মওলানা ভাসানী একবার ধানমন্ডির বাসভবনে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। এটা ১৯৭২ সালের মে মাসের শেষ বা জুন মাসের প্রথম দিকের ঘটনা। 'হক-কথা' সম্পাদক সৈয়দ ইরফানুল বারী লিখেছেন, 'নজরুল নিচের তলায় একটি লম্বা সোফায় ছেলেমানুষের মতো জড়সড় হইয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন। মেঝেতে কার্পেট বিছানো ছিল। হুজুর (মওলানা ভাসানী) সরাসরি নজরুলের সম্মুখে গিয়ে (যেভাবে নামাজে বসিতে হয়) বসিলেন। কবি ভবনের আঙ্গিনায়, বারান্দায় ও ভিতরে মানুষ গমগম করিতেছিল। কবির মুখাবয়বের দিকে হুজুর এক দৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। এর মধ্যে কবি দুইবার কি তিনবার চোখ মেলিয়া তাকাইলেন। অতঃপর বুজিয়া যেভাবে শুইয়াছিলেন সেই ভাবেই শুইয়া রহিলেন। হুজুর মিনিট তিনেক চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলেন। অতঃপর কাগজ কলম চাহিয়া লইলেন এবং তাহাতে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এবং তাঁহাকে দোয়া করিয়া ৭/৮টি বাক্য লিখিলেন।' (সৈয়দ ইরফানুল বারী, 'আমার ভালোবাসা মওলানা ভাসানী', ২০০৪; পৃষ্ঠা– ৬৩-৬৬)

মাত্র কয়েক মিনিটের হলেও এই ঘটনার মধ্যে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে। তাছাড়া কবি নজরুলের অধ্যাত্মিক সাধনা প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানীর কথাগুলো নিয়েও বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। এর মধ্য দিয়ে নজরুল সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত বা উপসংহারও বেরিয়ে আসতে পারে।

দৈনিক আমার দেশ, নজরুল সংখ্যা, ১১ জৈষ্ঠ, ১৪১৯; মে, ২০১২

বাকশাল-এর প্রতি মওলানা ভাসানীর 'আশীর্বাদ' প্রসঙ্গে

নিজের হাতে গড়ে তোলা দল আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে মওলানা ভাসানী কেন ন্যাশনালী আওয়ামী পার্টি গঠন করেছিলেন সে আলোচনায় যাওয়ার আগে সাপ্তাহিক 'সন্দ্বীপ'-এর ১ সেপ্টেম্বর (১৯৮৬) সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাকশাল বেসামাল' প্রতিবেদনের একটি বক্তব্যের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। বাকশালের প্রতিষ্ঠাকালীন ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখের এক পর্যায়ে প্রতিবেদক লিখেছেন : '...প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর জন্য তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি সাহায্যের অঙ্গিকার করলে মওলানা ভাসানী নয়া 'বাকশাল' পার্টিকে আশীর্বাদ করেন। এ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পঁচাত্তরে সন্তোষ গমন করলে তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। এমনকি রাস্তায় রাস্তায় তোরণ পর্যন্ত শোভা বর্ধন করেছিল।...'

বর্ণিত ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বলতে চাই, প্রতিবেদক এখানে সঠিক তথ্য উপস্থাপনায় ব্যর্থ হয়েছেন। বাকশালের জন্য 'আশীর্বাদ' লাভ কিংবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যদানের অঙ্গিকার করার জন্য রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব সেবার সন্তোষ যাননি, কাগমারীতে ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজকে সরকারি কলেজে রূপান্তরের ঘোষণা প্রদান ছিল তার সে সফরের প্রধান উদ্দেশ্য। যে কেউ ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চের সংবাদপত্র দেখতে পারেন। বিষয়টি পরিষ্কার করার প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার। স্বাধীনতার পর থেকে মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান জাতীয় নেতা হিসেবে প্রতিটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন মওলানা ভাসানী। আন্দোলনের এক পর্যায়ে, ১৯৭৪ সালের ৩০ জুন ঢাকায় গ্রেফতার করার পরদিন তাঁকে সন্তোষে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেদিন থেকেই তিনি 'গৃহবন্দী' হিসেবে অবস্থান করেছিলেন। শেখ মুজিবের আলোচ্য সফরকালেও তিনি বন্দীই ছিলেন এবং গৃহবন্দী ভাসানীর সাথেই সাক্ষাৎ করেছিলেন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান (মুজিব হত্যার মর্মান্তিক ঘটনার পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সরকারিভাবে মওলানা ভাসানীকে অন্তরীণাবস্থা থেকে মুক্তি দেয়া হয়)।

ওদিকে বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই মাওলানা ভাসানী সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন (১ জানুয়ারি, ১৯৭৫)। আজীবন

সংগ্রামী জননেতা মওলানা ভাসানীর অবসর গ্রহণের এই অবিশ্বাস্য ঘোষণার তাৎপর্য নিশ্চয়ই আলোচনার দাবি রাখে। এর ব্যাখ্যা হিসেবে একটি কথাই সম্ভবত যথেষ্ট যে, অত্যাসন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতি সমর্থন প্রদান কিংবা এক দলীয় বাকশালী ব্যবস্থার সাথে তাল মেলানোর অনিচ্ছা থেকেই তিনি অমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাকশালের প্রতি 'আশীর্বাদ' জানানোর ইচ্ছা থাকলে মওলানা ভাসানী আর যাই হোক রাজনীতি থেকে অবসর নেবার মতো কৌতূহলোদ্দীপক সিদ্ধান্তে আসতেন না এবং সে অবস্থায় 'উপদেষ্টা' ধরনের কোনো পদ সৃষ্টি করে তাঁকেও বাকশালের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার চমৎকার সুযোগ মুজিব নিশ্চয়ই হতাছাড়া করতেন না। কিন্তু বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি এবং অন্যদিকে মুজিব হত্যার পরপরই যেহেতু মওলানা ভাসানী রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তাই একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বাকশালের প্রতি 'আশীর্বাদ' জানানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। বরং পাছে বাকশালে যোগ দেয়ার প্রশ্ন এসে যায়– মূলত এ আশংকাই মওলানা ভাসানীকে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনে পরবর্তীকালে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। আপাতত 'আশীর্বাদ' প্রসঙ্গে কেবল এটুকুই বলা যায় যে, মওলানা ভাসানী সেবার তাঁর স্নেহাস্পদ 'মজিবর'কে ব্যক্তিগতভাবে 'আশীর্বাদ' করেছিলেন, বাকশালকে নয়। কিন্তু তারও আগে তিনি মুজিবকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন, সতর্ক করেছিলেন এবং উচ্চারণ করেছিলেন এক ভয়ংকর ভবিষ্যদ্বাণী। ঘটনাটি ঘটেছিল উল্লেখিত কলেজ প্রাঙ্গণে অবস্থিত দরবেশ হযরত শাহ জামান (র.)-এর মাজারের অভ্যন্তরে। উপদেশ প্রদানের এক পর্যায়ে মওলানা ভাসানী দেশ এবং দেশবাসীর স্বার্থে মুজিবকে একটি অঙ্গিকার করতে বলেছিলেন, সেই সাথে তিনি 'না হলে' সহযোগে এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা মাত্র সোয়া পাঁচ মাসের মধ্যেই নির্মম সত্যে পরিণত হয়েছিল। মুজিব সেদিন একটিও কথা উচ্চারণ করেননি, দাঁড়িয়েছিলেন কেবল মাথা নত করে এবং মাজারের বাইরে এসেই তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের ঘটনাটি সম্পর্কে রিপোর্ট না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাংবাদিকদের মধ্যে আমার পরিচিতরা এখনও বিভিন্নস্থানে কর্মরত, কেউ কেউ লিখবেনও বলেছিলেন। খুব আগ্রহী পাঠকদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাদের পরিচয় জানানো যেতে পারে। ভবিষ্যদ্বাণীটির কথা আমি অবশ্য এই মুহূর্তে লিখিত ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই না।

মওলানা ভাসানী নন, প্রকৃতপক্ষে মুজিবকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন কাদের সিদ্দিকীরা। প্রতিবেদনে সংবর্ধনা এবং তোরণ নির্মাণের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে

সেকথা সত্য হলেও তার উদ্যোক্তা মওলানা ভাসানী ছিলেন না। এর পেছনে ছিল টাঙ্গাইল জেলার বাকশাল, ছাত্রলীগ এবং সরকারি প্রশাসন। মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগেও সঙ্গত কারণে কলেজের প্রবেশ পথে তোরণ নির্মিত হয়েছিল, কিন্তু সন্তোষে তেমন কিছু হয়নি। মওলানা ভাসানী মুজিবকে 'সংবর্ধনা' জানিয়েছিলেন অত্যন্ত অনাড়ম্বর পরিবেশে, বুকে জড়িয়ে ধরে, 'বিপুলভাবে' নয়। এবং সেটাই ছিল তাঁদের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিক। সন্তোষ থেকে তাঁরা কাগমারী কলেজে গেছেন, অনুষ্ঠান শেষে আবার ফিরে এসেছেন সন্তোষে। দুপুরে মুজিব মওলানা ভাসানীর সাথে আহার করেছিলেন : সরকারিভাবে কোনো খাবার তালিকা আসেনি সেদিন, মওলানা ভাসানীর নির্দেশানুসারে টাঙ্গাইলের আদালত পাড়ায় ভাসানীভক্ত ব্যবসায়ী শেখ মোহাম্মদ সুলতানের বাসায় তার খাবার তৈরি হয়েছিল এবং তখনও কলেজ ছাত্র এই লেখকের ওপর ছিল সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। ভ্যান গাড়িতে ড্যাক বা ডেকচি ভরে মোরগ পোলাওসহ খাবার গিয়েছিল টাঙ্গাইল শহর থেকে। আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম।

বাকশাল প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো টাঙ্গাইল সফরকালে মুজিব সেবার 'বিপুলভাবে' সংবর্ধিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু একটু আগেই বলেছি, সে আয়োজনের পেছনে ছিলেন জেলার মুজিব সমর্থকরা। সঠিক ইতিহাসের স্বার্থে প্রসঙ্গত বিশেষভাবে বীর উত্তম কাদের সিদ্দিকীর কথা উল্লেখ করতে হয়। টাঙ্গাইল জেলার প্রবেশদ্বারে কাদের সিদ্দিকী প্রথম তার নেতাকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন, সেই সাথে সরকারি গাড়ি থেকে নামিয়ে মুজিবকে তুলে নিয়েছিলেন তার নিজের খোলা জিপে। এই খোলা জিপে চড়েই মুজিব সেদিন টাঙ্গাইল শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তার দু'পাশে ছিলেন কাদের সিদ্দিকী এবং লতিফ সিদ্দিকী, বাকশালের অন্য কোনো নেতা পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পাননি। মুজিবের এই সফরের প্রতিটি পর্যায়েই কাদের সিদ্দিকী তার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং আমার জানা মতে তোরণ নির্মাণ থেকে সংবর্ধনার আয়োজন পর্যন্ত সকল ব্যাপারে তিনিই সেবার প্রধান উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব পরবর্তীকালে কাদের সিদ্দিকীকে টাঙ্গাইল জেলার প্রথম গভর্নর হিসেবে নিযুক্তি দিয়েছিলেন।

বর্ণিত ঘটনাবলীর আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বাকশালকে মওলানা ভাসানী 'আশীর্বাদ' জানাননি এবং তোরণ নির্মাণসহ যে 'বিপুল' সংবর্ধনার কথা বলা হয়েছে তারও উদ্যোক্তা ছিলেন কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে টাঙ্গাইল জেলার মুজিব সমর্থকরা, মওলানা ভাসানী নন। এ কারণেই 'শ্রদ্ধাভাজন' মওলানা

ভাসানীর বাকশাল বিরোধী সমালোচনাও অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কোনো বিষয় ছিল না, আর তাই প্রতিবেদক মহোদয়ের 'অপ্রিয় সত্যভাষণ' করার মতো কষ্ট স্বীকার করারও কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আতাউর রহমান খানের সাথে মওলানা ভাসানীর নাম জড়িত করাও অনুচিত। কেননা বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক দল ও অবস্থান পরিবর্তনের কারণে 'ডিগবাজিদাতা' হিসেবে পরিচিত আতাউর রহমান খান ১৯৭৫ সালের ২৫ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলন করে বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। ১১৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তার অবস্থান ছিল ৭১ নম্বরে। সে কারণে আতাউর রহমান খান এবং মওলানা ভাসানীর অবস্থান ও ভূমিকা কোনো দিক থেকেই তুলনীয় হতে পারে না।

ভাসানীর সঙ্গে মুজিবকেও অসম্মানিত করা হয়েছে

আমার মনে হয়, প্রতিবেদক মহোদয় তৎকালীন ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন না এবং সংবাদপত্রও তিনি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পড়ার সুযোগ পাননি। তিনি সম্ভবত এটুকুই কেবল জানেন যে, বাকশাল গঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি শেষ মুজিবুর রহমান একবার সন্তোষ গিয়েছিলেন এবং সেখানে ভাসানী-মুজিবের সাক্ষাৎ হয়েছিল। মুজিব যে একটি কলেজকে সরকারিকরণের জন্য গিয়েছিলেন এবং কাদের সিদ্দিকীর টাঙ্গাইলে যে বিপুলসংখ্যক মুজিব সমর্থক থাকাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক– এই কথাগুলো তিনি সজ্ঞানে না হলেও খেয়াল করেনি। এর ফলেই তিনি মনের মতো করে ঘটনা সাজিয়েছেন, প্রতিবাদের ভাষায় যাকে 'বানোয়াট' বলতে হয়। প্রসঙ্গত তার উদ্দেশ্যের দিকটিও আলোচনার দাবি রাখে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্যের অঙ্গিকারের মতো অত্যন্ত নগণ্য একটি বিষয়কে তিনি বাকশালের প্রতি মওলানা ভাসানীর আশীর্বাদের 'পূর্বশর্ত' হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এই উক্তির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটি যে মওলানা ভাসানীর মতো সংগ্রামী জননেতাকে 'আদান-প্রদানের রাজনীতির' সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে অসম্মানিত করা, সে কথা নিশ্চয়ই উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু প্রতিবেদক মহোদয় একটি বিষয় লক্ষ্য করেননি। সেটা হলো, এর মাধ্যমে একই সঙ্গে তিনি মুজিবকেও মারাত্মকভাবে অসম্মানিত করেছেন। কেননা 'সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তা এবং ক্ষমতার অধিকারী' মুজিব কেবলমাত্র মওলানা ভাসানীর 'আশীর্বাদ' লাভের জন্য স্বয়ং সন্তোষ গিয়েছিলেন– কথাটার অন্য অর্থ দাঁড়ায়, মওলানা ভাসানী এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন, যার জন্য মুজিবের মতো রাষ্ট্রনায়ককেও তাঁর কাছে যেতে হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, বাকশালের প্রতি সমর্থন এবং 'আশীর্বাদ' অর্জনের প্রয়োজনে মুজিবকেও 'আদান-প্রদানের রাজনীতিই' করতে হয়েছে, আর তার

শর্তটি ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যের অঙ্গিকারের মতো সাধারণ একটি ব্যাপার। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মওলানা ভাসানী তাঁর সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি একে সমুদয় সম্পত্তিসহ ওয়াক্‌ফ করে গেছেন দেশবাসীর জন্য। সে কারণে অমন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি সাহায্য চাওয়ার মধ্যে প্রচলিত অর্থের 'আদান-প্রদানের' কেনো প্রশ্ন আনা উচিত নয়। এর ফলে মওলানা ভাসানীর যেমন কোনো অসম্মান হয় না, তেমনি মুজিবের ওপরও আরোপিত হয় না কোনো মাহাত্ম্যের মহিমা। ব্যাখ্যার এই দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখলে, আমার ধারণা, প্রতিবেদক মহোদয় অমন একটি অসম্মানজনক বক্তব্য রাখতে পারতেন না।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্যে প্রদানের প্রশ্নটি পঁচাত্তরেই প্রথম উত্তাপিত হয়নি। স্বাধীনতার পর থেকেই বিভিন্ন বিবৃতি, চিঠি এবং তারবার্তার মাধ্যমে মওলানা ভাসানী এই আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। দান বা অনুদান হিসেবে সাহায্য না করলেও মুজিব এবং তার সরকার বিভিন্ন সময়ে কাঠ, রড ও সিমেন্টের 'পারমিট' দিয়ে মওলানা ভাসানীকে সহায়তা করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর মুজিব শাসনামলে এই সামগ্রীগুলো খোলা বাজারে অত্যন্ত দুর্লভ ছিল এবং সে কারণে অন্য সকলের মতো মওলানা ভাসানীকেও 'পারমিট'-এর জন্য আবেদন জানাতে হতো তাঁর অধিকাংশ অনুরোধই রক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু সাথে সাথে নয়, এজন্য তাঁকে প্রায়ই মুজিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কাছে চিঠি কিংবা তারবার্তা পাঠাতে হতো। (এগুলোর কিছু কপি এই লেখকের সংগ্রহে আছে)। তাই বলে এমনটি বলা সঙ্গত নয় যে, মুজিব বা তার সরকার কখনো কোনো অর্থ বা নির্মাণ সামগ্রী 'সাহায্য' হিসেবে দান করেছিলেন, এমনকি কথিত 'অঙ্গিকার'-এর পরও নয়।

ইতিহাস বর্ণনাকালে নিরাসক্ত নিষ্ঠা দরকার

বাকশাল কিংবা শেখ মুজিবের রাজনীতি আজকের আলোচ্য বিষয় নয়, ওপরের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি আসলে একটি কথাই বলতে চেয়েছি। মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমান– দু'জনই আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের শেকড় হিসেবে বেঁচে থাকবেন। মতবাদ এবং সংগ্রামের কৌশলে বিভিন্নতা ও মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দু'জনই বাঙালী ও বাংলাদেশী জাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাদের যে কোনো একজনের প্রতি সমর্থন এবং অন্যজনের প্রতি বিরোধিতার দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের লালন যে কারো গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ইতিহাস বর্ণনাকালে প্রত্যেকেরই নিরাসক্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ এবং তথ্যনির্ভর

থাকা উচিত। একজনকে মহিমান্বিত করতে হলে অন্যজনকে অনিবার্যভাবেই অসম্মানিত করতে হবে– এমন ভাবনাতাড়িত হওয়া ঠিক নয়। অথচ দুঃখজনক সত্য হলো, এদেশের অধিকাংশ লেখক এবং ইতিহাসবিদই এক্ষেত্রে ব্যর্থতা দেখিয়ে থাকেন। ঘটনাক্রমে মওলানা ভাসানীর 'সৌভাগ্য' যে, তাঁর রাজনীতির দৃশ্যত জটিলতা এবং ব্যক্তি জীবনের বিভিন্নমুখী তৎপরতার কারণে 'কট্টর' সমর্থক এবং অনুসারী তিনি খুব বেশি রেখে যেতে পারেননি। যারা আছেন তারাও 'দরবেশ' এবং 'রাজনীতিক' ভাসানীকে নিয়ে বিতর্কে এখনও অনেক বেশি ব্যস্ততায় সময় কাটান।

কিন্তু মুজিবের 'দুর্ভাগ্য'ই বলতে হবে যে, এমন এক দল সমর্থক-লেখক তিনি পেয়ে গেছেন, যাদের অধিকাংশই তাকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতো অন্যায় পথে বেশি এগিয়ে যাচ্ছেন। এদের একদল তাকে সমুদ্র কিংবা সূর্যের সাথে তুলনা করেন, একদল তাকে 'বটগাছ' বলতে চান, আবার এমন কেউ কেউও আছেন, যারা মুজিবকে 'শাকের নিচে ঢাকা-পড়া তাজা মাছ' পর্যন্ত বানাতে সংকোচ বোধ করেন না! অন্য কথায়, এরা মুজিবের ওপর অলৌকিকত্ব আরোপের চেষ্টা করেন এবং এর ফলে তারা একটি সত্য অনুধাবনে ব্যর্থ হন যে, মুজিব এদেশেরই সাধারণ এক পরিবারের সন্তান এবং একজন রাজনীতিবিদ। গোপালগঞ্জের এক অজ পাড়া গাঁ থেকে উঠে আসা মুজিবই পরবর্তীকালে খ্যাতির শেখরে অরোহণ করেছিলেন রাজনীতিবিদ হিসেবে– এ কথার মধ্য দিয়েই সম্ভবত তার প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো যায়, সুবিচারও করা হয়। কিন্তু মুজিব সমর্থকরা উল্টো দিক থেকে দেখতে শুরু করেন, আগেই তারা তাকে শেখরে উঠিয়ে নেন। বাস্তবে মুজিবের মতো একজন রাজনীতিককে তার পরিণতিতে পৌঁছাতে দীর্ঘ এবং বন্ধুর পথ পরিক্রমণ করতে হয়েছিল। সে প্রক্রিয়ায় সাফল্যের পাশাপাশি অবশ্যই ছিল অনেক ব্যর্থতা এবং ভুল-ত্রুটিও। আলোচনাকালে এই দিকগুলোর কথা মনে রাখা দরকার এবং একটি কথা কোনো অবস্থাতেই বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, মুজিবও একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন, অলৌকিক কোনো পুরুষ নন।

- প্রতিবেদক বলতে এম আর আখতার মুকুলকে বোঝানো হয়েছে।
- সাপ্তাহিক সন্দীপ, ৮.৯.১৯৮৬ ('মওলানা ভাসানীর সময় ও সংগ্রাম' শিরোনামে প্রকাশিত ধারাবাহিক নিবন্ধের অংশ)

খন্দকার মোশতাকের প্রতি মওলানা ভাসানীর সমর্থন প্রসঙ্গে

ক'দিন আগে, গত ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ২২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। দিনটির প্রধান অনুষ্ঠানগুলো সন্তোষে হলেও সারাদেশেই আলোচনা সভা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মজলূম জননেতার প্রতি সম্মান জানানো হয়েছে, স্বাধীনতা যুদ্ধসহ নির্যাতিত জনগণের সকল সংগ্রামে তাঁর পুরোগামী নেতৃত্ব ও অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দিন আহমদ তার বাণীতে বলেছেন, "এদেশের নির্যাতিত অধিকারবঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সব ধরনের অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিল সর্বদাই সোচ্চার।...আমাদের জাতীয় রাজনীতির ইতিহাসে তিনি একজন ত্যাগী ও সংগ্রামী নেতা হিসেবে সবার শ্রদ্ধার পাত্র।" প্রেসিডেন্টের বাণীর শেষাংশে বলা হয়, "নীতির ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী ছিলেন আপসহীন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাপন, দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা এবং একটি কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।"

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মওলানা ভাসানীর উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তার বাণীতে বলেছেন, "পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে মওলানা ভাসানী ছিলেন আপসহীন। স্বৈরশাসন, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাঙালী জাতির পুনরুত্থানে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনই ছিল মওলানা ভাসানীর রাজনীতির জীবনের অভীষ্ট।' বাণীর শেষাংশে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রগাঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মওলানা ভাসানীর জীবনের আদর্শ বাংলাদেশের মানুষের জন্য চিরকাল প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।"

বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও মওলানা ভাসানীর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, "মওলানা ভাসানীর দেশপ্রেম ও আপসহীন সংগ্রামে উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী ষড়যন্ত্রের এবং একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শপথ নিতে হবে।"

ডেমোক্রেটিক লীগ নেতা অলি আহাদ থেকে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান মেনন পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক নেতাদের প্রায় সকলেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে মওলানা ভাসানীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন, স্মরণ করেছেন তাঁর নানামুখী অবদানের কথা। সেটাই স্বাভাবিক এজন্য যে, প্রায় ৮০ বছরের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে মওলানা ভাসানী নিজের দেশ এবং দেশবাসীর কল্যাণে অবদান রেখেছেন, জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং পালন করেছেন উদ্যোগী ও প্রধান নেতার আপসহীন ভূমিকা। মওলানা ভাসানীর সুদীর্ঘ ও কর্মময় জীবনের আলোচনা বা মূল্যায়ন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। শুধু এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, পাকিস্তান যুগে প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং পাকিস্তানে বিরোধী রাজনীতির সূচনা করা থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম প্রকাশ্য আহ্বান জানানো পর্যন্ত সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে তিনি থেকেছেন অগ্রবর্তী অবস্থানে। জামায়াতে ইসলামীর মতো দু'একটি মাত্র দল ছাড়া বাংলাদেশের সক্রিয় সকল রাজনৈতিক দলই কোনো না কোনোভাবে মওলানা ভাসানীর কাছে ঋণী। ১৯৭০ সালের ৩০ নভেম্বর মওলানা ভাসানী মুদ্রিত প্রচারপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং নিজের স্বাধীনতাকে ভারতের হাতে তুলে দিয়ে হলেও স্বদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে গঠিত কলকাতাকেন্দ্রিক মুজিবনগর সরকারকে সংঘাত ও অনৈক্যের অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে নেয়া ছিল মওলানা ভাসানীর প্রধান অবদান।

স্বাধীনতার পর প্রবল ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধেও মওলানা ভাসানীই প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন। সরকার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের সম্প্রসারণবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলা ছিল মওলানা ভাসানীর অবিস্মরণীয় অবদান। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বৃদ্ধ বয়সেও মওলানা ভাসানীকে নির্যাতিত হতে হয়েছে, জীবেনর ঝুঁকি নিয়ে তিনি অনশন করেছেন এবং আওয়ামী লীগ সরকার তাঁকে গ্রেফতার ও গৃহবন্দী করেছে। ১৯৭৪ সালের জুন থেকে '৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত মওলানা ভাসানীকে সন্তোষে গৃহবন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল। বাকশাল সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর গঠিত খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। জীবনের শেষ দিনগুলোতেও মওলানা ভাসানী তাঁর দেশপ্রেমিক অবস্থান অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৭৬ সালের ১৬ মে নিজের নেতৃত্ব অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ফারাক্কা মিছিল ছিল তাঁর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান।

মহান জাতীয় নেতা মওলানা ভাসানী সম্পর্কিত বর্তমান আলোচনার কারণ আসলে তাঁর অবদান তুলে ধরা নয়। একটি অসৎ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণার পরিপ্রক্ষিতে কিছু কথা বলা জরুরি হয়ে পড়েছে। বিগত কিছুদিনের মধ্যে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলাকে এক অস্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে। ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি সরকার সমর্থক সংবাদপত্রগুলোর পক্ষ থেকেও এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল যেন দেশ ও দেশবাসীর সামনে আর কোনো সমস্যা নেই, যেন সব দাবি ও সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে এবং দেশের সকল মানুষ শুধু ওই এক হত্যা মামলা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে! ক্ষমতাসীনদের এই কৌশলের সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো সংবাদপত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় সকল নেতাকে পরোক্ষভাবে হলেও মুজিব হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সে প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিশেষ একটি দৈনিক মওলানা ভাসানীকেও প্রশ্নের সম্মুখীন করার উদ্যোগ নিয়েছে। মওলানা ভাসানী নাকি খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, 'দোয়া' করেছিলেন এবং এ সম্পর্কিত খবর ও মওলানা ভাসানীর বিবৃতি নাকি সে সময় দেশের 'প্রধান প্রধান সকল দৈনিকে' প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, দৈনিকটি আরো লিখেছে, ১৯৭৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সাক্ষাৎ করার এই ঘটনাকেই খন্দকার মোশতাকের প্রতি মওলানা ভাসানীর সমর্থনের 'প্রমাণ' হিসেবে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট মোশতাক কেন মওলানা ভাসানীর কাছে গিয়েছিলেন এবং এই যাওয়াটা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল কি না সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আলোচ্য প্রতিবেদনের অন্য একটি দিককে আলোচনায় আনা দরকার। বলা হয়েছে, 'প্রধান প্রধান সকল দৈনিকে' নাকি মওলানা ভাসানীর বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। কথাটি পড়ে যে কারো মনে হতে পারে যেন সে সময় দেশে আজকের মতো অসংখ্য সংবাদপত্র ছিল এবং সেগুলোর মধ্যে 'প্রধান প্রধান সকল দৈনিকে' মওলানা ভাসানীর বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল! কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হলো, বাকশাল তথা একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র চারটি ছাড়া দেশের সকল দৈনিককে নিষিদ্ধ করেছিলেন। এই চারটির মধ্যে আগে থেকে সরকারি মালিকানাধীন দৈনিক বাংলার পাশাপাশি অন্য তিনটিকে সরকারি মালিকানায় এনেছিলেন অগণতান্ত্রিকভাবে। সুতরাং 'প্রধান প্রধান সকল দৈনিক' বলাটা মোটেই সমীচীন নয়। কারণ দেশে তখন সব মিলিয়ে দৈনিকই ছিল মাত্র

চারটি এবং চারটিই ছিল সরকারি মালিকানায়। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল পরবর্তীকালে। ১৫ আগস্টের পরপর যখন বিবৃতিটি প্রকাশিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তখন সরকারি মালিকানাধীন দৈনিকের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে স্বাভাবিক কারণেই। শুধু তা-ই নয়, আলোচ্য প্রতিবেদনে মওলানা ভাসানীর বিবৃতি উদ্ধৃত করা হয়েছে 'বিশ্বস্ত সূত্রের' বরাত দিয়ে। সততা ও সদিচ্ছা থাকলে বিশেষ দৈনিকটি থেকে সরাসরিই বিবৃতিটি উদ্ধৃত করা সম্ভব ছিল এবং ইতিহাস গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে তেমনটি করা প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু সহজবোধ্য কারণে দৈনিকটি থেকে কথিত বিবৃতি সরাসরি উদ্ধৃত করা হয়নি বরং আশ্রয় করা হয়েছে 'বিশ্বস্ত সূত্র'কে।

সাক্ষাতের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়নি এ কারণে যে, মওলানা ভাসানীর মতো মহান জাতীয় নেতার জন্য অমন ঘটনা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। পাকিস্তান যুগে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খানের পর এমন কোনো গভর্নর জেনারেল, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রাদেশিক গভর্নরের নাম বলা যাবে না, যিনি কোনো না কোনো সময়ে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেছেন। অন্য সকলকে পাশে রেখে শুধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রসঙ্গে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, রাজনৈতিক বিরোধিতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল সমস্যায় তিনি মওলানা ভাসানীর কাছে ছুটে গেছেন। গেছেন অত্যন্ত স্নেহভাজন হিসেবে, যাকে মওলানা ভাসানী 'নিজের ছেলের মতো' বলতেন প্রকাশ্যেই। কিন্তু পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে সব সময় শেখ মুজিব প্রকাশ্যে যাননি। প্রকাশ্যে যখন গেছেন, তখন সকলের সামনে মওলানা ভাসানীকে তিনি পায়ে হাত দিয়ে কদমবুচি করেছেন এবং সে ছবি ও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে 'প্রধান প্রধান' দৈনিকগুলোতেও (যেমন ৯ মার্চ ১৯৭৫-এর দৈনিক বাংলায়)। কিন্তু সহজবোধ্য কারণে শেখ মুজিব বেশিবার গেছেন গোপনীয়তার সঙ্গে। তথ্যাভিজ্ঞদের মতে রাজধানীতে এবং সন্তোষে তো বটেই, দু'জনের সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়েছে এমনকি ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মতো অচিন্ত্যনীয় কিছু স্থানেও। কিন্তু সঙ্গত কারণেই এ বিষয়ে কোনো সংবাদ প্রচার করা হয়নি।

ভাসানী-মুজিবের এ ধরনের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে চমৎকার একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। 'ভাসানীকে যেমন জেনেছি' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন (পৃ. ৭৮-৭৮) : 'গভর্নরদের নাম ঘোষণার তিন-চারদিন আগে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে গণভবনে গেছি। দেখি বঙ্গবন্ধু বের হচ্ছেন। দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, "কোনো কাজ আছে নাকি?" বললাম, "না, এমনিই আপনাকে দেখতে এসেছিলাম।" বঙ্গবন্ধু আর ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেব একটা টয়োটা

গাড়িতে উঠলেন। সাধারণত বাড়িতে ফেরার সময় তিনি মার্সিডিসে ফেরেন এবং একা। আমি ভাবলাম, বঙ্গবন্ধুর পিছু পিছু তাঁর বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে বাসায় ফিরবো। ওমা! গণভবনের গেট ছেড়ে গাড়ি ডানে না গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলো। আমরাও পিছু নিলাম। ভাবলাম অন্য কোথাও যাবেন। ফার্মগেট থেকে শহরের দিকে না গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিলো। আমরাও পিছু নিলাম। ভাবলাম অন্য কোথাও যাবেন। ফার্মগেট থেকে শহরের দিকে না গিয়ে গাড়ি ঘুরলো টাঙ্গাইলের দিকে। অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে আমরা যখন চৌরাস্তা পর্যন্ত এলাম, তখনো বুঝতে পারিনি যাচ্ছেন কোথায়। চৌরাস্তায় এসে পরে বুঝলাম টাঙ্গাইল যাচ্ছেন। সত্যিই তাই। উনি সন্তোষ গেলেন। বাড়ির সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো। বঙ্গবন্ধু ও মনসুর ভাই হুজুরের ঘরে গেলেন। আমি প্রায় তিনশ' গজ পেছনে রাস্তা থেকে দূরে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। খুব সম্ভবত তাদের মিনিট চল্লিশেক আলাপ হলো। আবার ছুটলেন ঢাকার দিকে। আমি পিছু নিলাম। সন্তোষ থেকে সোজা ধানমণ্ডি। হাওয়ার বেগে গাড়ি ফিরে এলো। ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির মোড়ে গাড়ি থামালাম, আর এগুলাম না। কাণ্ড কারখানা দেখার জন্য গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যেভাবে গাড়িটা বাড়ির ভেতর ঢুকেছিলো, মিনিট চারেক পরে সেভাবেই আবার বেরিয়ে এলো। আমি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, তাই গাড়ির আলো সোজাসুজি আমার চোখে পড়েছিল। গাড়ি এসে আমার সামনে থামলো। দেখি পেছনে মনুসর ভাই বসা। মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলেন, কাদের তুমি এখানে?

কি আর করবো? আপনারা ওভাবে একা একা গেলে দাঁড়িয়ে না থেকে উপায় কি?

–ও, তাহলে ড্রাইভার যে বারবার বলছিলো, কেউ আমাদের ফলো করছে সেটা ঠিক? তুমি আমাদের পিছু নিয়েছিলে?

–না নিয়ে উপায় কি বলুন। হাত চেপে ধরে বললেন, "খবরটা যেন বাইরে না যায়।"

ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে মূলত মওলানা ভাসানীর মহানুভবতা এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাঁর গুরুত্বের দিক দুটিকে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে পরামর্শ দিয়েছেন এবং কখনো তিনি 'পাছে লোকে কিছু বলে' প্রবাদকে গুরুত্ব দেননি। গোপনীয়তা রাখা হয়েছে শেখ মুজিবের স্বার্থে। প্রেসিডেন্ট মোশতাককেও মওলানা ভাসানী একই জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের মতো না হলেও খন্দকার মোশতাক আহমদও মওলানা ভাসানীর স্নেহভাজন ছিলেন। প্রাসঙ্গিক অন্য তথ্যটি হলো, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর

প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোশতাকই 'সরকারিভাবে' মওলানা ভাসানীকে গৃহবন্দীর অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বিচ্ছিন্নভাবে দেখার পরিবর্তে বিষয়টিকে তাই সমগ্র প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে বিবেচনায় নিতে হবে। তিনজনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের আলোকে একথা মানতেই হবে যে, মওলানা ভাসানীর দিক থেকে শেখ মুজিবের তুলনায় খন্দকার মোশতাককে অগ্রাধিকার দেয়ার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির কারণে মওলানা ভাসানীকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে স্পষ্ট করতে হয়েছিল। শেখ মুজিবের নিজের অনুসারীরা যখন পালিয়ে গেছেন, দেশের কোনো অঞ্চলেই যখন সামান্য প্রতিবাদী আন্দোলন হয়নি, তেমন একটি পরিস্থিতিতে মুজিব বিরোধী হিসেবে পরিচিত এবং তখনও গৃহবন্দী মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের সমর্থনে দাঁড়াবেন– এমনটি নিশ্চয়ই কল্পনা করা উচিত নয়। অন্যদিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সে সময় ভারতের হস্তক্ষেপের আশংকা দ্রুত বেড়ে চলছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বও এসে গিয়েছিল হুমকির সামনে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মওলানা ভাসানী মোশতাক সরকারের বিরোধিতা করেননি এবং তাকে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, পরবর্তীকালে জাতীয় স্বার্থ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের একই দৃষ্টিকোণ থেকে গৃহীত নীতি ও অবস্থানের কারণে জেনারেল জিয়াউর রহমানও মওলানা ভাসানীর কাছে গেছেন– যেমনটি যেতেন শেখ মুজিব, যেভাবে গিয়েছিলেন খন্দকার মোশতাক।

আমরা মনে করি, মওলানা ভাসানীর মতো আজীবন সংগ্রামী এবং দেশপ্রেমিক জাতীয় নেতা সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার আগে সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। মওলানা ভাসানী সব সময় জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতেন। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে শেষ পর্যন্তও তিনি ছিলেন আপসহীন। শেখ মুজিব-উত্তরকালে এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর নীতি-কৌশল ও অবস্থান নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু তারপরও অন্তত শেখ মুজিবের প্রশ্নে মওলানা ভাসানীর অবস্থানকে বিতর্কিত করা অনুচিত। কারণ, ভাসানী-মুজিবের সম্পর্ক প্রসঙ্গে যাদের সামান্যও ধারণা রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই একবাক্যে স্বীকার করবেন, 'নিজের ছেলের মতো' প্রিয় শেখ মুজিবের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় মওলানা ভাসানী অবশ্যই ব্যথিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্ভবত অযথাই উল্লেখ করেননি যে, মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের মধ্যে ছিল 'প্রগাঢ় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।'

উপসম্পাদকীয় নিবন্ধ, দৈনিক ইনকিলাব, ১.২.১৯৯৮

পল্টন ময়দানে হুকুমতে রব্বানীয়া সমিতির জনসভায় ভাষণ দিচ্ছেন : ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৪

ঢা. মেডি. কলেজ হাসপাতালে অনশনরত মওলানা ভাসানীকে দেখতে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান : মে, ১৯৭৩

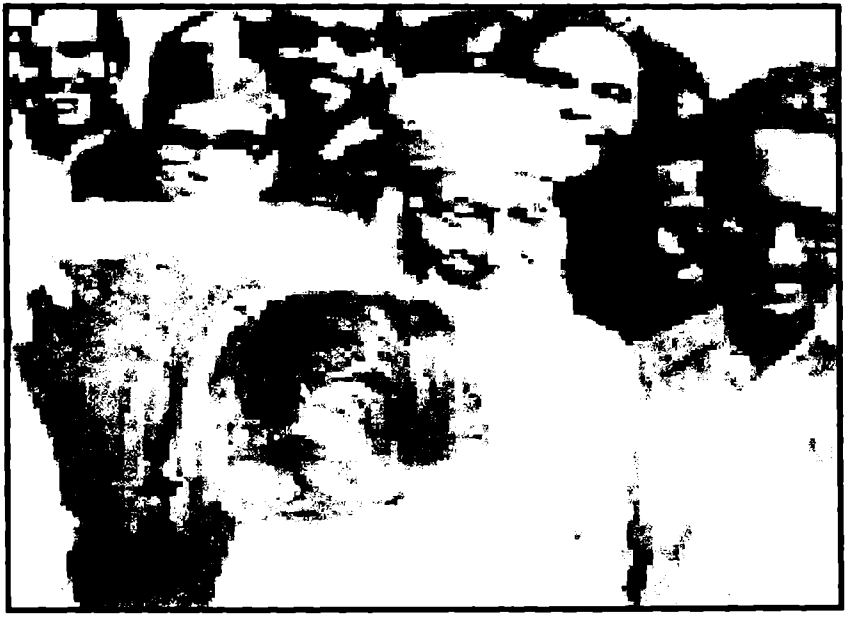

রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সন্তোষে গেলে সস্নেহে জড়িয়ে ধরেছেন মওলানা ভাসানী : ৮ মার্চ, ১৯৭৫

Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani

CHANCELLOR, ISLAMI VISHWAVIDYALAYA — SANTOSH, Bangladesh
Chairman, National Awami Party
President, Krishak Samity
President, Hukumate Rabbania Samity.

Ref. .... Date ....

হিন্দুস্থানের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের যুক্ত ইশতেহারের পরিপ্রেক্ষিতে

আন্তর্জাতিক সীমা সংক্রান্ত ফারাক্কা বাঁধের পানি বন্টনের মীমাংসা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্য বাঁচা ও মরিবার প্রশ্ন ছিল। কিন্তু ইহার কোন মীমাংসা করা হয় নাই। হিন্দুস্থান বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছিটমহলের প্রশ্নেও কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। বেরুবাড়ীর দেশবাসী ও হিন্দুস্থানের সুপ্রীম কোর্টের রায় দিয়াছে বেরুবাড়ী বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শেখ মুজিবুর রহমান তাহা হিন্দুস্থানের হাতে তুলিয়া দিয়া সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানিয়াছে। এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে বাংলাদেশের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে। তাই এক মাসের জন্য আমার অনশন সত্যের ঘোষণা।

রায় — বেরুবাড়ী বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইহা কিছুতেই হস্তান্তর করিতে পারে না। এটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বাংলাদেশের মানুষ কিছুতেই পরিত্যাগ করিবে না।

[illegible]

★ [illegible]

মুজিব-ইন্দিরা যৌথ ইশতেহারের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানীর লিখিত বিবৃতির অংশ : ১৭ মে, ১৯৭৪

জুলুম প্রতিরোধ মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মওলানা ভাসানী। ডান পার্শ্বে ন্যাপনেতা মশিউর রহমান যাদু মিয়া এবং বামে জাতীয় লীগ নেত্রী আমেনা বেগম

যুগে যুগে
মওলানা ভাসানীর সংগ্রাম

শাহ আহমদ রেজা